দেয়াল

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

ভূমিকা – আনিসুজ্জামান

হুমায়ূন আহমেদের অবর্তমানে তার উপন্যাস দেয়াল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রকাশকের ইচ্ছায় আমি তার ভূমিকা লিখছি। বইটির যে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন ছিল, আমার তা মনে হয় না।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই দেয়াল নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিষয়টা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। হাইকোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী লেখক উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশিত রূপের পরিবর্তন সাধন করেছেন। গ্রন্থাকারে সেই পরিবর্তিত রূপই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তারপরও, আমার মনে হয়, দেয়াল বিতর্কিত থেকে যাবে।

বইটিতে দুটি আখ্যান সমান্তরালে চলেছে। প্রথমটি অবন্তি নামে এক চপলমতি ও প্রচলনবিরোধী মেয়ের কাহিনি। তার বাবা নিরুদ্দিষ্ট। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মা ইসাবেলা স্বদেশ স্পেনে চলে গেছেন। এই দম্পতির কেউ যে সাধারণ বিচারে স্বাভাবিক, তা মনে হয় না। অবন্তি টাকায় বাস করে পিতামহ সরফরাজ খানের সঙ্গে তিনি রক্ষণশীল এবং খেয়ালি—অবন্তিকে লেখা তার মায়ের চিঠি আগে গোপনে খুলে পড়েন, অবন্তির শিক্ষক শফিকের ওপর নজরদারি করেন এবং আরও অনেক কিছু করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নিরাপত্তার খোঁজে ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যান, সেখানেও টিকতে না পেরে আশ্রয় নেন এক পীরের বাড়িতে। এক পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা অবন্তিকে দেখে ফেলে বিয়ে করতে চায়। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পীর নিজের ছেলের সঙ্গে অবন্তির বিয়ে দিয়ে দেন। অবন্তি

এ-বিয়ে মেনে নেয় না বটে, কিন্তু হাফেজ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন করে না। তা নিয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সরফরাজ খানের পুত্রের বন্ধুদের একজন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ। এ-বাড়িতে তার আসা-যাওয়া আছে। তার সূত্রে কর্নেল তাহেরও এখানে এসেছেন। এভাবেই প্রথম আখ্যানের সঙ্গে দ্বিতীয় আখ্যানের যোগ সাধিত হয়।

দ্বিতীয় আখ্যানটি সূচিত হয় মেজর ফারুকের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে। এই পরিকল্পনায় ফারুক ও মেজর রশীদ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও ওসমানীকে জড়িত করে। পরিকল্পনার সাফল্য, খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতালাভ, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান, কারাগারে চার নেতা হত্যা, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার বিপ্লব, জিয়াউর রহমানের মুক্তিলাভ ও ক্ষমতাগ্রহণ, খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল হুদার হত্যা এবং তাহেরের ফাঁসিতে উপাখ্যানের সমাপ্তি। তারপরও লেখক দ্রুত ঘটনা বলে গেছেন, উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে জিয়ার হত্যাকাণ্ডে।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এসব শোকাবহ পর্বের বর্ণনায় যে-পরিসর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল, বইতে তা দেওয়া হয় নি। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে অন্নবস্ত্রের অভাব এবং রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার ও তাদের প্রতি সর্বসাধারণের ক্ষোভ ও ঘৃণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে বঙ্গপিতা, মহামানব ও বঙ্গবন্ধু বলা হলেও মৃত্যুতে তিনি লেখকের অতটা সহানুভূতি লাভ করেননি যতটা পেয়েছেন তার পরিবারের শিশু ও নারীরা। বঙ্গবন্ধু হত্যায় মানুষের মধ্য থেকে যে প্রবল প্রতিবাদ হলো না, বরঞ্চ কোথাও কোথাও আনন্দ-মিছিল হলো, এতে লেখক বিস্মিত (কাদের সিদ্দিকীর প্রতিবাদ সম্পর্কে

হুমায়ুনের মন্তব্য “ভারতে তিনি কাদেরিয়া বাহিনী তৈরি করে সীমান্তে বাংলাদেশের থানা আক্রমণ করে নিরীহ পুলিশ মারতে লাগলেন। পুলিশ বেচারারা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে জড়িত না, বরং সবার আগে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার জন্যে তারা প্রাণ দিয়েছে।”)। অবন্তির গৃহশিক্ষক শফিক—যে নিজেকে খুবই ভীতু বলে পরিচয় দেয়, সে—কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুজিব হত্যার বিচার চাই’ বলে স্লোগান দেয়, গ্রেপ্তার হয় এবং নিপীড়ন সহ্য করে। খন্দকার মোশতাককে এ-বইতে আমরা পাই কমিক চরিত্ররূপে। অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম খালেদ মোশাররফ এবং মহাবীর কর্নেল তাহেরের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এবং উপন্যাসে কর্নেল তাহেরকেও দেখি খালেদ মোশাররফের সাহসিকতা ও চরিত্রগুণের প্রশংসা করতে। জিয়াউর রহমানের আর্থিক সততার প্রশংসা আছে, জনগণের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা বলা হয়েছে, সেইসঙ্গে তাঁর ক্ষমতালোভের কথা বলা হয়েছে এবং সরকারি তথ্য উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে যে, ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তার গঠিত সামরিক আদালতের বিচারে ১১৪৩ জন সৈনিক ও অফিসারকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে। হুমায়ুনের মতে, এদের দীর্ঘনিশ্বাস জমা হয় চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে—সেখানে জিয়া প্রাণ হারান তার এক সময়ের সাথী জেনারেল মঞ্জুরের পাঠানো ঘাতক বাহিনীর হাতে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বইতে কোনো তথ্য নেই, বরঞ্চ এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে মনজুরের রূপবতী স্ত্রীর প্রলয়ংকরী স্ত্রীবুদ্ধি কাজ করে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন, ‘উপন্যাস উপন্যাস—উপন্যাস ইতিহাস নহে’, সে-কথা যথার্থ। তবে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের সারসত্য অবিকৃত থাকবে বলে আশা করা হয় এবং কল্পনাপ্রসূত আখ্যানেও কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত।

দেয়াল উপন্যাসের প্রথমদিকে হুমায়ুন আহমেদ নিজের উল্লেখ করেছে প্রথম পুরুষে, শেষদিকে এসে উত্তমপুরুষে নিজের কথা সে বলে গেছে। আমরা জানতে পারি—অনেকেরই তা অজানা নয় যে—শহীদ-পরিবার হিসেবে ঢাকা শহরে হুমায়ূনদের সরকারিভাবে যে-বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়, রক্ষী বাহিনীর এক কর্মকর্তা তা দখল করে তাদেরকে নির্মমভাবে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে পথে নামিয়ে দেন; হুমায়ুনের মা এবং ভাইবোনেরা শুধু চরম অপমানের শিকার হন, তা নয়, নিরাপত্তার সম্পূর্ণ অভাবে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হুমায়ূনকে বাকশালে যোগ দিতে চাপ দেওয়া হয় এবং চাপের কাছে নতিস্বীকার করে রসায়ন বিভাগে, রেজিস্ট্রারের অফিসে এবং উপাচার্যের দপ্তরে ছোটাছুটি করেও শেষ পর্যন্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে তার প্রয়াস নিষ্ফল হয়, বাকশালে যোগদান থেকে সে বেঁচেই যায় বলতে হবে। এসব ঘটনা বঙ্গবন্ধুর সরকার সম্পর্কে তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অন্যপক্ষে কর্নেল তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেনের সূত্রে তাহেরের সঙ্গে সে পরিচিত হয়, তার মাকে নিজের মায়ের মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়। তাহেরের জীবনাবসান তার মনে গভীর দাগ ফেলে যায়—এতটাই যে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে অপহরণের পরিকল্পনাকে সাহসী’ বলে উপন্যাসে প্রশংসা করা হয়েছে। আমার ধারণা, হুমায়ূনের এই ব্যক্তিগত পটভূমি এই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার উপস্থাপনে তাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্রথম আখ্যানেই আমরা পরিচিত হুমায়ূন আহমেদকে পাই। চরিত্রের খেয়ালিপনা, সংলাপের সংঘাত, ঘটনার আকস্মিকতা ও কার্যকারণহীনতা আমাদের সবসময়ে রহস্যময়তার দিকে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় আখ্যানের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্যে হুমায়ূন বইপত্র এবং মামলার কাগজপত্রের শরণাপন্ন হয়েছে। তবে তারপরও তথ্যগত ত্রুটি রয়ে গেছে। কাহিনি

বলা থামিয়ে লেখক কখনো তারিখ দিয়ে মোটা দাগে ঘটনার বিবরণ লিখে গেছে। শেষে এক লাফে ছ বছর সময় পেরিয়ে উপসংহারে পৌঁছেছে।

এরই মধ্যে ছড়িয়ে আছে হুমায়ুনের স্বভাবসিদ্ধ এপিগ্রাম। সামান্য নমুনা দিই :

মানুষ এবং পশু শুধু যে বন্ধু খোঁজে তা না, তারা প্রভুও খোঁজে।

এই পৃথিবীতে মূল্যবান শুধু মানুষের জীবন, আর সবই মূল্যহীন।

কিছু বিদ্যা মানুষের ভেতর থাকে। সে নিজেও তা জানে না।

যে লাঠি দিয়ে অন্ধ মানুষ পথ চলে, সেই লাঠি দিয়ে মানুষও খুন করা যায়।

মানবজাতির স্বভাব হচ্ছে সে সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

সমালোচক যা-ই বলুক না কেন, আমি জানি, হুমায়ূন আহমেদের অন্য বইয়ের মতো দেয়ালও পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

আনিসুজ্জামান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

১. ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ আছে। লালচে রঙের মেঘ। যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তবে দেখায় অপূর্ব। এই গাঢ় লাল, এই হালকা হলুদ, আবার চোখের নিমিষে লালের সঙ্গে খয়েরি মিশে সম্পূর্ণ অন্য রঙ। রঙের খেলা যিনি খেলছেন মনে হয় তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

শফিক চা খেতে খেতে আকাশের রঙের খেলা দেখছে। সে চা খাচ্ছে ধানমণ্ডি দশ নম্বর রোডের মাঝখানে একটা চায়ের দোকানে। অস্থায়ী দোকান ছিল, এখন মনে হয় স্থায়ী হয়ে গেছে। হালকা-পাতলা শিরিষ গাছের পাশে দোকান। শিরিষ গাছের মধ্যে তেজিভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। সে আকাশ স্পর্শ করার স্পর্ধা নিয়ে বড় হচ্ছে।

শফিক চা শেষ করে পকেটে হাত দিয়ে দেখে মানিব্যাগ আনে নি। এরকম ভুল তার সচরাচর হয় না। তার আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। চায়ের সঙ্গে সিগারেট। শফিক মনস্থির করতে পারছে না। সঙ্গে মানিব্যাগ নেই—এই তথ্য দোকানিকে আগে দেবে, নাকি চা-সিগারেট খেয়ে তারপর দেবে!

শফিকের হাতে বিভূতিভূষণের একটা উপন্যাস। উপন্যাসের নাম ইছামতি। বইটির দ্বিতীয় পাতায় শফিক লিখেছে—‘অবন্তিকে শুভ জন্মদিন’। বইটা নিয়ে শফিক ব্রিত অবস্থায় আছে। বইটা অবন্তিকে সে দিবে, নাকি ফেরত নিয়ে যাবে? এখন কেন জানি মনে হচ্ছে ফেরত নেওয়াই ভালো।

অবন্তির বয়স ষোল। সে ভিকারুননিসা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। শফিক তাকে বাসায় অংক শেখায়। আজ অবন্তির জন্মদিন। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শফিককে বলা হয় নি। অবন্তি শুধু বলেছে, তের তারিখ আপনি আসবেন না। ওইদিন আমাদের বাসায় ঘরোয়া একটা উৎসব আছে। আমার জন্মদিন।

শফিক বলেছে, ও আচ্ছা!

অবন্তি বলেছে, জন্মদিনে আমি আমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে ডাকি না। দাদাজান তার বন্ধুবান্ধবকে যেতে বলেন।

শফিক আবারও বলেছে, ও আচ্ছা।

অবন্তি বলেছে, আপনাকে জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করা হয় নি, এই নিয়ে মন খারাপ করবেন না।

শফিক তৃতীয়বারের মতো বলল, ও আচ্ছা। শেষবারে 'ও আচ্ছা' না বলে বলা উচিত ছিল 'মন খারাপ করব না'।

যে উৎসবে শফিকের নিমন্ত্রণ হয় নি, সেই উৎসব উপলক্ষে উপহার কিনে নিয়ে যাওয়া অস্বস্তির ব্যাপার। শফিক ঠিক করে রেখেছে বইটা অবন্তিদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। সমস্যা একটাই—দারোয়ান সবদিন থাকে না। গেট থাকে ফাঁকা। তবে আজ যেহেতু বাড়িতে একটা উৎসব, দারোয়ানের থাকার কথা।

শফিক দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি। আপনার টাকাটা আগামীকাল ঠিক এই সময় দিয়ে দিব। চলবে?

দোকানি কোনো জবাব দিল না। সে গরম পানি দিয়ে কাপ ধুচ্ছে। তার চেহারার সঙ্গে একজন বিখ্যাত মানুষের চেহারার সাদৃশ্য আছে। মানুষটা কে মনে পড়ছে না। দোকানির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো মনে পড়বে। শফিক অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমাকে আরেক কাপ চা খাওয়ান, আর একটা ক্যাপস্টান সিগারেট। আগামীকাল ঠিক এই সময় আপনার সব টাকা দিয়ে দেব।

দোকানি কাপ ধোয়া বন্ধ রেখে শফিকের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। দোকানির চোখের চাউনি দেখে শফিক নিশ্চিত হলো, তার চেহারা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতো। আব্রাহাম লিংকন লম্বা, আর এ বেঁটে। বেঁটে আব্রাহাম লিংকন। উইলিয়াম বুথ এই আব্রাহাম লিংকনকে গুলি করলে গুলি লাগত না। মাথার ওপর দিয়ে চলে যেত।

দোকানি বলল, আমার হাত ভিজা, আপনে বৈয়ম খুইলা ছিরগেট নেন।

ভাদ্র মাসের লাল মেঘে বৃষ্টি পড়ার কথা না, কিন্তু বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। ফোটা ঘন হয়ে পড়ছে। আশ্চর্যের কথা, ব্যাঙ ডাকছে। আশপাশে ডোবা নেই যে ব্যাঙ থাকবে। ধানমণ্ডি লেকের কোনো ব্যাঙ কি রাস্তায় নেমে এসেছে? বর্ষায়। কই মাছ পাড়া বেড়াতে বের হয়, ব্যাঙরা কি বের হয়?

শফিক ইছামতি বইটা সিগারেটের বৈয়মের ওপর রেখে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়েছে।

দোকানি বলল, আপনে ভিজতেছেন কী জন্যে? চালার নিচে খাড়ান। ভাদ্র মাসের বৃষ্টি আসে আর যায়। এক্ষণ বৃষ্টি থামব। আসমানে তারা ফুটব।

শফিক দোকানির পাশে বসেছে। সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চায়ের দোকানের সামনে কালো রঙের একটা কুকুর এসে দাঁড়িয়েছে। কুকুরটা প্রকাণ্ড। দেশি কুকুর এত বড় হয় না।

দোকানি বলল, কুত্তার শইলটা দেখছেন? হালা ডোম্বা জোয়ান।

শফিক বলল, হুঁ। বিরাট।

বড়লোকের কুত্তার সাথে দেশি কুত্তি সেক্স করছে বইলা এই জিনিসের পয়দা হইছে। দেখলে ভয় লাগে।

দোকানি বৈয়াম খুলে একটা টোস্ট বিস্কুট ছুড়ে দিল। কুকুর বিস্কুট কামড়ে ধরে চলে গেল। সে মনে হয় টোস্ট বিস্কুটের বিষয়ে আগ্রহী না। কিংবা ক্ষুধা নেই। ক্ষুধার্ত কুকুর এইখানেই কচকচ করে বিস্কুট খেত, আড়ালে চলে যেত না।

দোকানি বলল, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় এই ডোম্বা কুত্তা আহে। এরে একটা বিস্কুট দেই, মুখে নিয়া চইল্যা যায়। ঠিক করছি কুত্তাটারে ভালোমতো একদিন খানা দিব। গো-ভাত।

শফিক বলল, আপনার চেহারার সঙ্গে অতি বিখ্যাত একজন মানুষের চেহারার মিল আছে। নাম আব্রাহাম লিংকন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

দোকানি বলল, গরিবের আবার চেহারা কী? আপনার নাম কী?

গরিবের নামও থাকে না। বাপ-মা কাদের বইল্যা ডাকে। আমার নাম কাদের মোল্লা। নামের শেষে 'মোল্লা' কেন লাগাইছে আমি জানি না। নামাজের ধারেকাছে নাই। মাকুন্দা মানুষ। থুতনিতে একগাছা দাড়িও নাই, নাম হইছে মোল্লা!

ছাতা মাথায় কে যেন এগিয়ে আসছে। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে গেছে। লোকটা পানিতে ছপ ছপ শব্দ করতে করতে আসছে। শফিক আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু পুরোপুরি চেনা যাচ্ছে না। আজকাল শফিকের এই সমস্যা হচ্ছে, প্রথম দর্শনেই কাউকে সে চিনতে পারছে না।

মাস্টার সাব, এইখানে কী করেন?

অবন্তিদের বাড়ির দারোয়ান কালাম ছাতা মাথায় দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় বিড়ি কিনতে এসেছে। শফিক ব্রিত গলায় বলল, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।

কালাম বলল, ঘরে আসেন। ঘরে আইসা বসেন।

শফিক বলল, ঘরে যাব না। তুমি অবন্তিকে এই বইটা দিয়ে। তার জন্মদিনের উপহার। বই দিতে এসে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি। বইটা সাবধানে নিয়ো, বৃষ্টিতে যেন ভিজে না। তোমার আপার হাতেই দিয়ো।

কালাম গলা নামিয়ে বলল, বই আফার হাতেই দিব। আপনি টেনশান কইরেন না। বলেই সে চোখ টিপ দেওয়ার ভান করল। শফিকের গা জ্বলে গেল। একবার ইচ্ছা করল বলে, 'চোখ টিপ দিলে কেন?' শফিকের অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করে, শেষ পর্যন্ত বলা হয় না।

কালাম বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। সে দুই শলা সিগারেট কিনতে এসেছে, মাস্টারের সামনে কিনতে পারছে না। শফিক উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করা অর্থহীন, এই বৃষ্টি থামবে না।

ভয়ঙ্কর কালো কুকুরটা আবার উদয় হয়েছে। সে যাচ্ছে শফিকের পেছনে পেছনে। শফিক কয়েকবার বলল, এই, যা বললাম, যা! লাভ হলো না। পানিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে কুকুর পেছনে পেছনে আসছেই। হঠাৎ ছুটে এসে পা কামড়ে ধরবে না তো? শফিক হাঁটার গতি বাড়াল। কুকুরও তা-ই করল। ভালো যন্ত্রণা তো!

অবন্তির দাদা সরফরাজ খানের হাতে ইছামতি বই। দারোয়ান বইটা সরাসরি তার হাতে দিয়েছে। তিনি প্রথমে পাতা উল্টিয়ে দেখলেন, লুকানো কোনো চিঠি আছে কি না। বদ প্রাইভেট মাস্টারেরা বইয়ের ভেতর লুকিয়ে প্রেমপত্র পাঠায়। অতি পুরনো টেকনিক। চিঠি পাওয়া গেল না। বইটা তিনি ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখলেন। আগে নিজে পড়ে দেখবেন। বইয়ের লেখায় কোনো ইঙ্গিত কি আছে? হয়তো দেখা যাবে এক প্রাইভেট মাষ্টারকে নিয়ে কাহিনি। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে সেই মেয়ে মাস্টারকে বিয়ে করে। তাদের সুখের সংসার হয়। গল্প-উপন্যাস হলো অল্পবয়েসী মেয়েদের মাথা খারাপের

মন্ত্র। তার মতে, দেশে এমন আইন থাকা উচিত যেন বিয়ের আগে কোনো মেয়ে 'আউট বই পড়তে না পারে। বিয়ের পরে যত ইচ্ছা পড়ুক। তখন মাথা খারাপ হলে সমস্যা নাই। মাথা খারাপ ঠিক করার লোক আছে। স্বামীর সঙ্গে আদর সোহাগে একটা রাত পার করলেই মাথা লাইনে চলে আসবে।

সরফরাজ খান ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। নাতনির জন্মদিনের নিমন্ত্রিত অতিথিরা এখনো কেউ আসে নি। যেভাবে বৃষ্টি নামছে কেউ আসবে কি

কে জানে! রাতেরবেলা এমনিতেই কেউ বের হতে চায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অস্ত্র মানুষের হাতে চলে গিয়েছিল তা সব উদ্ধার হয় নি। দিনদুপুরেই ডাকাতি-ছিনতাই হচ্ছে। যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কথা, তাদের কেউ কেউ ডাকাতি-ছিনতাইয়ে নেমেছে। সরফরাজ খানের মনে হলো, ভারতের সেনাবাহিনীকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় করা ভুল হয়েছে। এরা থাকত আরও কিছুদিন।

সরফরাজ গলা উঁচিয়ে এ বাড়ির একমাত্র কাজের মেয়ে রহিমাকে ডাকলেন। রহিমা পনের বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। যতই দিন যাচ্ছে তার কর্তৃত্ব ততই বাড়ছে। এখন সে মুখে মুখে কথা বলে।

রহিমা এসে দাঁড়াল, মাথায় ঘোমটা দিতে দিতে বলল, কী বলবেন 'তাড়াতাড়ি বলেন। পাক বসাইছি। বুড়া গরুর মাংস আনছে, সিদ্ধ হওনের নাম নাই।

সরফরাজ বললেন, এখন থেকে মাস্টার যতক্ষণ অবন্তিকে পড়াবে তুমি সামনে বসে থাকবে।

এইটা কেমন কথা! আমার কাইজকাম কে করব?

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন, এ বাড়িতে আমি আর অবন্তি এই দুজন মানুষ। এত কাজকর্ম কোথায় দেখলে? শুধু বাড়তি কথা।

রহিমা বলল, দুইজন মানুষ এইটা কী বললেন? আমরারে মানুষের মধ্যে ধরেন না? আমি আছি, ডেরাইভার ভাই আছে, দারোয়ান আছে। সবের পাক এক চুলায় হয়। পাঁচজন মানুষ। আপনের কথা শেষ হইছে? এখন যাব?

অবন্তি কোথায়?

আফা ছাদে।

বৃষ্টির মধ্যে সে ছাদে কী করে?

এইটা আফারে জিগান। আমি ক্যামনে বলব! যে আসামি সে জবানবন্দি দিবে, আমি আসামি না। আমি বৃষ্টির মধ্যে ছাদে যাই নাই।

কথাবার্তা হিসাব রেখে বলবে। এখন যাও, অবন্তিকে আমার কাছে পাঠাও। আর যে কথা প্রথম বললাম, অবন্তি যখন তার মাস্টারের কাছে পড়বে তুমি উপস্থিত থাকবে। প্রতিদিন থাকতে হবে না। মাঝে মাঝে আমি থাকব।

তাদের মধ্যে কোনো ঘটনা কি ঘটেছে?

জানি না। ঘটতে পারে। সাবধান থাকা ভালো। তুমি টেবিলের নিচে তাদের পায়ের দিকে লক্ষ রাখবে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি দেখলেই বুঝবে ঘটনা ঘটেছে। এরকম কিছু চোখে পড়লে মাস্টারকে কানে ধরে বিদায় করব। বদ কোথাকার!

অবন্তি ছাদে হাঁটছে, তবে বৃষ্টিতে ভিজছে না। তার গায়ে নীল রঙের রেইনকোট। এই রেইনকোট তার মা ইসাবেলা স্পেন থেকে গত বছর পাঠিয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার। এ বছরের জন্মদিনের উপহার এখনো এসে পৌঁছায় নি। তবে জন্মদিন উপলক্ষে লেখা চিঠি এসে পৌঁছেছে। অবন্তি সেই চিঠি এখনো পড়ে নি। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় পড়বে। ইসাবেলা তার মেয়েকে বছরে দুটা চিঠি পাঠান। একটা তার জন্মদিনে, আরেকটা খ্রিসমাসে।

অবন্তিদের ছাদ ঝোঁপঝাড়ে বোঝাই এক জংলি জায়গা। তার দাদি জীবিত থাকা অবস্থায় ছাদে বড় বড় টব তুলে নানান গাছপালা লাগিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত ছাদে আসতেন, গাছগুলির যত্ন নিতেন। তার মৃত্যুর পর অবন্তি ছাদে আসে। কিন্তু টবের গাছে পানি দেয় না। গাছগুলি নিজের মতো বড় হয়েছে। কিছু মরে গেছে। কিছু টবে আগাছা জন্মেছে। একটা কামিনীগাছ হয়েছে বিশাল। বর্ষায় ফুল ফোটে। সেই গা তীব্র। আজ অবশ্যি কামিনী ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না। এমন কি হতে পারে কিছু বিশেষ দিনে কামিনী ফুল গন্ধ দেয় না!

ছাদের রেলিংয়ের একটা অংশ ভাঙা। অবন্তি মাঝে মাঝেই রেলিংয়ের ভাঙা অংশে দাঁড়ায়। সে ঠিক করে রেখেছে, কোনো-একদিন সে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দেবে। ঝাঁপ দিয়ে যেখানে পড়বে সে জায়গাটা বাধানো। কাজেই তার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। আজ সে ঝাঁপ দেবে না বলেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নেমে এল। রহিমা বলল, আপনেরে দাদা ডাকে। মনে হয় কোনো জটিল কথা বলবে।

অবন্তি তার দাদাজানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, দাদাজান, জটিল কথা কিছু বলবে?

সরফরাজ নাতনির দিকে তাকিয়ে প্রবল দুঃখবোধে আপ্লুত হলেন। মেয়েটা পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে চলে এসেছে। অতি রূপবতীদের কপালে দুঃখ ছাড়া কিছু থাকে না। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে চাপতে বললেন, হুঁ, বলব।

উপদেশমূলক কথা? জন্মদিনে উপদেশমূলক কথা শুনতে ভালো লাগে না।

কী ধরনের কথা শুনতে ভালো লাগে?

মজার কোনো কথা।

সরফরাজ বিরক্ত গলায় বললেন, আমি তো মজার কোনো কথা জানি না।

অবন্তি বলল, আমি জানি। আমি বলি তুমি শোনো—

আমার মার নাম স্পেনের রানি ইসাবেলার নামে। রানি ইসাবেলা সারা জীবনে দু'বার মাত্র স্নান করেছেন।

সরফরাজ বললেন, এটা তো মজার গল্প না। নোংরা থাকার গল্প।

অবন্তি বলল, রানি ইসাবেলা যখন দরবারে যেতেন তখন পোশাক পরতেন। বাকি সময় নগ্ন ঘোরাফেরা করতেন। গায়ে কাপড় লাগলে গা কুটকুট করত এই জন্যে।

সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন, এই গল্প তোমাকে কে বলেছে? মাস্টার।

উনি এই গল্প কেন করবেন? মা চিঠিতে লিখেছেন। মা চিঠিতে মজার কথা লেখেন।

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন, যে চিঠিতে এই গল্প আছে সেই চিঠি আমাকে পড়তে দিবে।

কেন?

আমার ধারণা কোনো চিঠিতে এমন কথা তোমার মা লিখে নাই। এই নোংরা গল্প অন্য কেউ তোমার সঙ্গে করেছে। বুঝেছ?

অবন্তি হাসল।

সরফরাজ বললেন, হাসছ কেন? তোমার এই গল্প আমি সিরিয়াসলি নিয়েছি।

অবন্তি বলল, তুমি সবকিছুই সিরিয়াসলি নাও। আমার বিষয়ে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

তোমার বিষয়ে কে ভাববে?

আমার বিষয়ে ভাবার লোক আছে।

লোকটা কে?

তোমাকে বলব না, তবে রানি ইসাবেলা সম্পর্কে আরেকটা কথা বলব।

ওই নোংরা বেটির কোনো কথা শুনব না।

কথাটা শুনলে অবাক হবে।

তোমার সঙ্গে থাকা মানেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবাক হওয়া। আর অবাক হতে চাচ্ছি না।

ঘনঘন অবাক হলে লিভারের ফাংশান ভালো থাকে। তোমার লিভার ফাংশান ভালো থাকা দরকার।

সরফরাজ বিরক্ত গলায় বললেন, কী বলবে বলে ঝামেলা শেষ করো।

অবন্তি বলল, আমেরিকার প্রথম ডাকটিকিটে যে ছবি ছাপা হয়েছিল সেই ছবি রানি ইসাবেলার।

সরফরাজ জবাব দেওয়ার আগেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। নিমন্ত্রিত অতিথিদের কেউ মনে হয় এসেছেন। অবন্তি গেল দরজা খুলতে।

প্রথম অতিথির নাম খালেদ মোশাররফ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। অবন্তির বাবার বন্ধু। তারা স্কুলজীবনে একসঙ্গে দাড়িয়াবান্দা খেলতেন। খালেদ মোশাররফের ফুসফুসের জোর ছিল অসাধারণ। কুঁ ডাক দিয়ে তিন মিনিট ধরে থাকা সহজ ব্যাপার না।

অবন্তি মা! কেমন আছ?

ভালো আছি চাচ্চু।

আজ তোমাকে অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর লাগছে। এর কারণ কী মা?

চাচ্চু! আপনি যখনই আসেন এই কথা বলেন।

খালেদ মোশাররফ বললেন, আমি মিলিটারি মানুষ। যা দেখি তা-ই বলি। আমি তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারি না, অবন্তিকে আজ অন্যদিনের চেয়ে একটু কম সুন্দর লাগছে।

মিলিটারিরা কি সবসময় সত্যি কথা বলে?

না রে মা। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে তখন অবশ্যই বলে। যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলার সুযোগ থাকে না। ভালো কথা, তোমার বাবার কোনো খবর কি পাওয়া গেছে?

না।

মানুষটা কি হারিয়েই গেল? আশ্চর্য!

অবন্তি বলল, বাবার বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিছুদিন পর পর ডুব দেওয়া তার স্বভাব।

সরফরাজ ভেতর থেকে বললেন, কে এসেছে? খালেদ?

অবন্তি বলল, হ্যাঁ দাদাজান। জন্মদিনের পার্টি এখন শুরু হলো।

খালেদ মোশাররফ বললেন, জন্মদিন নাকি? কার জন্মদিন?

অবন্তি অবলীলায় বলল, দাদাজানের।

আগে জানলে তো কিছু-একটা নিয়ে আসতাম।

অবন্তি বলল, এখনো সময় আছে। চট করে কিছু-একটা নিয়ে আসুন। শুধু ফুল আনবেন না। দাদাজান ফুল পছন্দ করেন না।

খালেদ মোশাররফ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরফরাজ বললেন, কে এসেছে?

অবন্তি বলল, যে এসেছে সে চলেও গেছে।

সরফরাজ বললেন, তার মানে? ওই শোনো জিপ স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। জিপ নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আশ্চর্য!

শফিক তার ঝিগাতলার বাসার বারান্দায় কেরোসিনের চুলায় ভাত বসিয়েছে। দুপুরের ডাল রয়ে গেছে। রাতে ডালের সঙ্গে ডিম ভাজা করা হবে। ডাল থেকে টক গন্ধ আসছে। মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে। গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা। শফিক ঠিক করল এখন থেকে বাড়তি কিছু রান্না হবে না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই রাঁধবে।

বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশের মানুষ একবেলা রুটি খাচ্ছে। শফিক রুটি খেতে পারে না। রুটি বানানোও ঝামেলা। আটা দিয়ে কাই বানাও, বেলুন দিয়ে রুটি বেলো, তাওয়ায় সেঁকো। মেলা দিগদারি।

সবচেয়ে ভালো হয় রাধানাথ বাবুর মতো একবেলা খাওয়ার অভ্যাস করলে। তিনি সূর্য ডোবার সামান্য আগে একবেলা খান। তাতে যদি তাঁর সমস্যা না হয় শফিকের কেন হবে! রাধানাথ বাবু এখন একটা বই লিখছেন—রবীন্দ্রনাথ এবং বৌদ্ধধর্ম। তার নানান রকম অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য দরকার হয়। শফিকের ওপর দায়িত্ব পড়ে তথ্য অনুসন্ধানের। শফিককে তিনি মাগনা খাটান না। প্রতিটি তথ্যের জন্যে কুড়ি টাকা করে দেন। রাধানাথ বাবুর কাছে শফিকের চল্লিশ টাকা পাওনা হয়েছে। রাধানাথ বাবু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো-এক জায়গায় জীবন এবং মৃত্যুকে রমণীর দুই স্তন হিসেবে ভেবেছেন। আমার কিছুই মনে

পড়ছে না। তুমি খুঁজে বের করতে পারলে চল্লিশ টাকা দেব। রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করো।

শফিক আজই খুঁজে পেয়েছে। কাল সকালে যাবে, টাকাটা নিয়ে আসবে। তার হাত একেবারেই খালি। হাত খালি থাকলে তার অস্থির লাগে। মনে হয় পায়ের নিচে মাটি নেই, চোরাবালি। চোরাবালিতে সে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, কাল টাকা পাওয়া যাবে। চোরাবালি থেকে মুক্তি।

রাধানাথ বাবুর কবিতার লাইন দুটি আছে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে। কবিতার নাম মৃত্যু।

স্তন হতে তুলে নিলে কাদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

ভাত হয়ে গেছে। ডিম ভাজা গেল না। একটাই ডিম ছিল, সেটা পচা বের হয়েছে। শফিক টকে যাওয়া ডাল দিয়ে খেতে বসল। কয়েক নলার বেশি খাওয়া গেল না। শরীর উল্টে আসছে। আজকের ডালমাখা ভাত অবশ্যি নষ্ট হবে না। বিশাল কুকুরটা তার পেছনে পেছনে এসে মেঝেতে থাবা গেড়ে বসে আছে। সে নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। এত বড় শরীরের জন্যে প্রচুর খাদ্য দরকার।

শফিক ডাল মাখানো ভাত উঠানে ঢেলে দিল। কী আগ্রহ করেই না কুকুরটা খাচ্ছে! ঘরে একটা টিনের থালা থাকলে থালায় ভাত দেওয়া যেত। পশুপাখিরাও তো কিছুটা সম্মান আশা করতে পারে। শফিক বলল, এই তোর নাম কী?

কুকুরটা মাথা তুলে তাকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিল।

শফিক বলল, আমি তোর নাম দিলাম কালাপাহাড়। ঐতিহাসিক চরিত্র। নাম পছন্দ হয়েছে?

কুকুর এইবার ঘেউ শব্দ করল। মনে হয় নাম পছন্দ হয়েছে।

শফিক বলল, খাওয়াদাওয়া করে চলে যা। আমি খুবই গরিব মানুষ। ডালটা নষ্ট না হলে আমিই খেতাম। তোকে দিতাম না। আমার অবস্থান তোর চেয়ে খুব যে ওপরে তা কিন্তু না।

কালাপাহাড় আরেকবার ঘেউ করে শুয়ে পড়ল। তার ডিনার শেষ হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির রাতে সে আর বের হবে না। এখানেই থাকবে। একজন প্রভু পাওয়া গেছে, এই আনন্দেও সে মনে হয় খানিকটা আনন্দিত। মানুষ এবং পশু শুধু যে বন্ধু খোঁজে তা না, তারা প্রভুও খোঁজে।

অবন্তি মায়ের চিঠি নিয়ে শুয়েছে। খাম খুলেই সে প্রথমে গন্ধ শুকল। তার মা চিঠিতে দু' ফোঁটা পারফিউম দিয়ে খাম বন্ধ করেন। গন্ধের খানিকটা থেকে যায়।

আজকের গন্ধটা অদ্ভুত। চা-পাতা চা-পাতা গন্ধ। মা'র কাছ থেকে এই পারফিউমের নাম জানতে হবে। অবন্তি চিঠি পড়তে শুরু করল–

শুভ জন্মদিন অবন্তি মা,

তুমি তোমার যে ছবি পাঠিয়েছ, এই মুহূর্তে তা আমার লেখার টেবিলে। আমি প্রবল ঈর্ষা নিয়ে ছবিটির দিকে তাকাতে তাকাতে তোমাকে লিখছি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে পৃথিবীতে এসেছ। তোমার মতো বয়সে সবাই আমাকে ডাকত 'Flower'। তোমার নাম আমি দিলাম 'স্বর্গের পুষ্প'। একটাই ত্রুটি–তোমার চোখ আমার চোখের মতো নীল হয় নি। তুমি তোমার বাবার কালো চোখ পেয়েছ। ভালো কথা, তোমার বাবার সঙ্গে কি তোমার কোনো যোগাযোগ হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষটা কি শেষ পর্যন্ত হারিয়েই গেল?

তুমি চিঠিতে তোমার এক গৃহশিক্ষকের কথা লিখেছ। তুমি কি এই যুবকের প্রেমে পড়েছ? চট করে কারও প্রেমে পড়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা না। অতি রূপবতীদের কারও প্রেমে পড়তে নেই। অন্যেরা তাদের প্রেমে পড়বে, তা-ই নিয়ম।

এখন আমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছি। তুমি কি আসবে আমার এখানে?

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি হতদরিদ্র দেশে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তোমার বৃদ্ধ দাদাজানকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে দেশে পড়ে থাকতে হবে—এটা কোনো কাজের কথা না। তোমার জীবন তোমার একারই। এক বৃদ্ধকে সেখানে জড়ানোর কিছু নেই। সে বরং একটা কমবয়সী মেয়ে বিয়ে করুক। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তোমার বাস করাকেও আমি ভালো চোখে দেখছি না। সেক্স-ডিজাইভড় বৃদ্ধরা নানান কুকাণ্ড করে। আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তায় আছি।

লুইসের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি একা বাস করছি। লুইসের কারণে আমি অনেক টাকার মালিক হয়েছি। ঠিক করেছি সমুদ্রের কাছে একটা ভিলা কিনে বাস করব। তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকতে পারো। মা-মেয়ে সুখে জীবন পার করে দেব।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে পারফিউমের একটা সেট পাঠালাম। তোমার ষোল বছর হয়েছে বলে ষোলটা পারফিউম। এর মধ্যে তোমার কাছে সবচেয়ে ভাললাটার নাম আমাকে লিখে পাঠাবে। যদি আমার পছন্দের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে পুরস্কার আছে।

মা, তুমি ভালো থেকো। প্রায়ই তোমাকে নিয়ে আমি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি, আমার অস্থির লাগে।

ইসাবেলা

মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভাদ্র মাসে চাঁদের আলো সবচেয়ে প্রবল হয়। চারদিকে পানি জমে থাকে বলে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভাদ্রের চন্দ্র-রাত আলোময় হয়।

শফিক বারান্দায় কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। বৃষ্টিভেজা উঠান চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। এই রূপ শফিককে স্পর্শ করছে এরকম মনে হচ্ছে না। সে ক্ষুধায় অস্থির। ক্ষুধার সময় দেবতা সামনে এসে দাঁড়ালে তাঁকেও নাকি খাদ্যদ্রব্য মনে হয়।

কালো কুকুরটা এখনো আছে। শফিক বেঞ্চে বসামাত্র সে উঠে এসে বেঞ্চের নিচে ঢুকে পড়ল। একথালা টকে যাওয়া ডালমাখা ভাত খেয়ে সে কৃতজ্ঞতায় অস্থির হয়ে আছে।

শফিক ডাকল, কালাপাহাড়! এই কালাপাহাড়!

কালাপাহাড় সাড়া দিল। বেঞ্চের নিচ থেকে মাথা বের করে তাকাল শফিকের দিকে। শফিক বলল, কুকুর হয়ে জন্মানোর একটা সুবিধা আছে। খুব ক্ষুধার্ত হলে ডাস্টবিন ঘাটাঘাটি করলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়। মানুষের এই সুবিধা নেই।

কালাপাহাড় বিচিত্র শব্দ করল। শফিকের কেন জানি মনে হলো কুকুরটা তার কথা বুঝতে পেরে জবাব দিয়েছে। শফিকের হঠাৎ করেই গায়ে কাঁটা দিল।

শফিকের মা জোবেদা খানমের একটা পোষা কুকুর ছিল। জোবেদা খানম কুকুরটাকে 'কপালপোড়া' বলে ডাকতেন। কেউ তার গায়ে গরম ভাতের মাড় ফেলে কপাল পুড়িয়ে দিয়েছিল। কুকুরটা জোবেদা খানমের সঙ্গে কথা বলত এবং ভদ্রমহিলার ধারণা তিনি কুকুরের সব কথা বুঝতে পারতেন।

শফিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আমার মা স্কিজিওফ্রেনিয়ার রোগী ছিলেন। এইসব রোগীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে।

আসলেই কি তাই? নাকি অন্যকিছু? জগৎ অতি রহস্যময়। হয়তো তার মা সত্যি সত্যি পশুপাখির কথা বুঝতেন।

এক শ্রাবণ মাসের কথা। গভীর রাত। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জোবেদা শফিককে ডেকে তুলে বললেন, বাবা! হারিকেন আর ছাতি নিয়ে একটু আগা তো।

শফিক অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাব?

ঈশ্বরগঞ্জ থেকে তোর বাবা আসছে। কাঠের পুলের কাছে এসে ভয় পাচ্ছে। তোর বাবাকে একটু কষ্ট করে নিয়ে আয়।

শফিক বলল, বাবা এসেছেন—এই খবর তুমি কোথায় পেয়েছ?

কপালপোড়া আমাকে বলেছে।

কুকুরটা তোমাকে বাবার সংবাদ দিয়েছে?

হুঁ।

শফিক শীতল গলায় বলল, এক কাজ করো, কুকুরের গলায় হারিকেন ঝুলিয়ে দাও। সে বাবাকে পুল পার করে নিয়ে আসুক।

জোবেদা খানম ক্ষীণ গলায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, বাবা! যা-না। মায়ের অনুরোধটা রাখ। মার কথাটা শোন।

শফিক বলল, মা, তোমার কথা আমি এক শ'বার শুনব। কুকুরের কথা শুনব। কুকুরের কথায় ঝড়-বৃষ্টির রাতে কাঠের ব্রিজের কাছে যাব না।

জোবেদা বলল, মানুষটা ভূতের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। কাঠের ব্রিজ পার হতে পারছে না।

ভূত বলে কিছু নেই মা। ভূত গ্রামের দুর্বল মানুষের কল্পনা। মাথা নেই একটা ভূত কাঠের পুলে বসে থাকে। নিশিরাতে কেউ পুল পার হতে গেলে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। এইসব হলো গল্প।

জোবেদা বললেন, বাবারে! কয়েকজন তো মারা গেছে।

কয়েকজন না, দুজন মারা গেছে। তারা পা পিছলে খালে পড়ে মরেছে। আমি নিশিরাতে অনেকবার পুল পার হয়েছি। আমি মাথাকাটা ভূত দেখি নাই।

ভূত-প্রেত সবার কাছে যায় না। কারও কারও কাছে যায়।

মা! ঘুমাও তো।

শফিক কাথার নিচে ঢুকে বাক্যালাপের ইতি করল। সেই রাতে তার ভালো ঘুম হলো। ঘুম ভাঙল লোকজনের হইচই চিকারের শব্দে। তার বাবার মৃতদেহ কাঠের পুলের নিচে পাওয়া গেছে। তার হাতে চটের ব্যাগ। ব্যাগে একটা শাড়ি। নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর জন্যে কেনা। আর একটা হারমোনিকা।

হারমোনিকা তিনি কেন কিনেছিলেন, কার জন্যে কিনেছিলেন, এই রহস্য ভেদ হয় নি। শফিকের বাবা হারমোনিকা কেনার মানুষ না। তিনি মাওলানা মানুষ।

কিছু রহস্য মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সেইসব রহস্যের কখনোই কোনো কিনারা হয় না।

হারমোনিকা শফিকের কাছে আছে। কখনো এই বাদ্যযন্ত্রে ফু দেওয়া হয় নি। শফিক ঠিক করে রেখেছে তার জীবনে যদি কখনো গাঢ় আনন্দের ব্যাপার ঘটে, তাহলে সে হারমোনিকায় ফুঁ দেবে।

রাত অনেক হয়েছে। অবন্তি ঘুমাতে গেছে। রহিমা, অবন্তির ঘরে মেঝেতে বিছানা করেছে। অবন্তি একা ঘুমাতে চায়, সরফরাজ খানের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

রহিমার নানান সমস্যা আছে। সে ঘুমের মধ্যে কথা বলে, হঠাৎ হঠাৎ বিকট শব্দে তার নাক ডাকে। তারচেয়েও বড় সমস্যা হলো, মাঝে মাঝে রহিমা জেগে বসে থাকে। তাকে দেখে তখন মনে হয় সে কাউকে চিনতে পারছে না। এই সময় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

রহিমা বলল, পান খাইবেন আফা?

অবন্তি বলল, না।

রহিমা বলল, জর্দা দিয়া পান খাইলে মেয়েছেলের শইলে সুঘ্রাণ হয়।

অবন্তি বলল, জর্দা খেয়ে শরীরে সুঘ্রাণ করার কিছু নাই। গায়ে পারফিউম দিলেই হয়।

রহিমা হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি খোয়াবে একটা জিনিস পাইছি, বলব?

না। কথা বলাবলি বন্ধ। এখন ঘুম।

রহিমা বলল, খোয়বে পাইছি মাস্টার সাবের সাথে আপনার শাদি হবে।

অবন্তি কঠিন গলায় বলল, আমি আর একটা কথাও শুনব না।

রহিমা বলল, আমি নিজের মনে কথা বলি। শুনলে শুনবেন, না শুনলে নাই। আপনার আর মাস্টার সাবের বিবাহ হবে গোপনে। আপনার দাদাজানের অমতে। মামলা মোকদ্দমা হবে। শেষমেষ মিটমাট হবে। আমি খোয়বে পাইছি। আমার খোয়ব বড়ই কঠিন। একবার কী হইছে শুনেন, খোয়বে পাইলাম...

রহিমা কথা বলেই যাচ্ছে।

অবন্তি দুই হাতে কান চেপে ধরে মনে মনে গান করছে-'আমার এই হেসে যাওয়াতেই আনন্দ খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে সুমন্দ।

মনে মনে গান করলে বাইরের কোনো শব্দ কানে ঢোকে না। এই আবিষ্কার অবন্তির নিজের।

২. রাধানাথ বাবুর বয়স পঁয়ষট্টি

রাধানাথ বাবুর বয়স পঁয়ষট্টি। তার মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুলের দিকে তাকালেই শুধু বয়স বোঝা যায়। চুলে কলপ করা হলে বয়স ত্রিশের কোঠায় নেমে আসত। সবল সুঠাম বেঁটেখাটো মানুষ। চোখ বড় বড় বলে মনে হয় তিনি সারাক্ষণ বিস্মিত হয়ে আছেন। তাঁর গাত্রবর্ণ অস্বাভাবিক গৌর। তার মাসি বলতেন, আমার রাধুর গা থেকে আলো বের হয়। রাতেরবেলা এই আলোতে তুলসি দাসের রামায়ণ পড়া যায়।

চিরকুমার এই মানুষটি নীলক্ষেতের একটা দোতলা বাড়ির চিলেকোঠায় থাকেন। একতলায় তাঁর প্রেস। প্রেসের নাম 'আদর্শলিপি' প্রেসের সঙ্গে জিংক ব্লকের একটা ছোট্ট কারখানাও আছে। প্রেসের লোকজন তাকে ডাকেন সাধুবাবা। সাধুবাবা ডাকার যৌক্তিক কারণ আছে। তাঁর আচার-আচরণ, জীবনযাপন সাধুসন্তদের মতো।

বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর প্রার্থনার ব্যবস্থা। পশমের আসনে বসে চোখ বন্ধ করে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনায় বসেন। তাঁর সামনে থাকে ভুষাকালির একটা বাঁধানো পায়ের ছাপ। এই পায়ের ছাপে বুড়ো আঙুল নেই। এই ছাপটা কার পায়ের তা তিনি কাউকে এখনো বলেন নি। প্রার্থনার সময় পায়ের ছাপের সামনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। ধূপ পোড়ানো হয়। কোনো কোনো দিন প্রার্থনা দ্রুত শেষ হয়, আবার দীর্ঘসময় নিয়েও প্রার্থনা চলে। সারা রাত প্রার্থনা চলেছে এমন নজিরও আছে।

সাধুবাবা রাধানাথ শুচিবায়ুগ্রস্ত। কিন্তু তিনি মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন। তার পরিচিত সবাই বিষয়টি জানে। খুব সাবধানে থাকে। দৈবাৎ কারও গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেলে

তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান করেন। স্নানের পর ভেজা কাপড় বদলান না। ভেজা কাপড় গায়ে শুকান।

তিনি নিরামিষাশি এবং একাহারি। সূর্য ডোবার আগে আগে খাবার খান, তবে সারা দিনই ঘনঘন চা খান, লেবুর শরবত খান। বেদানা তার প্রিয় ফল। পাথরের বাটিতে সব সময়ই দানা ছড়ানো বেদানা থাকে।

রাধানাথ বাবুর সামনে দৈনিক ইত্তেফাক হাতে শফিক বসে আছে। সে এই বাড়িতে প্রতিদিন সকাল ন'টার মধ্যে এসে পড়ে। তার দুটি দায়িত্বের একটি রাধানাথ বাবুকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো এবং অন্যটি হলো তাঁর ডিকটেশন নেওয়া। কিছুদিন হলো রাধানাথ বাবুর চোখের সমস্যা হচ্ছে। পড়তে গেলে বা লিখতে গেলে চোখ কড়কড় করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছে চোখের পাতায় খুশকি হয়েছে। চিরকাল তিনি জেনেছেন খুশকি মাথায় হয়। খুশকি যে চোখের পাতায়ও হয় তা তার জানা ছিল। জগতের কতকিছুই যে জানেন না তা ভেবে সেদিন তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শফিক বলল, আগে কি হেডলাইনগুলি পড়ব?

রাধানাথ বললেন, পত্রিকায় সবচেয়ে ভালো খবর আজ কী ছাপা হয়েছে সেটা পড়ো। এরপর পড়বে সবচেয়ে খারাপ খবর। ভালো ও মন্দে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

শফিক বলল, ভালো খবর তেমন কিছু পাচ্ছি না। রাধানাথ বললেন, একটা জাতীয় দৈনিকে ভালো কোনো খবর ছাপা হবে না তা হয় না। ভালোমতো খুঁজে দেখো, নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু আছে। রিকশাওয়ালার সততা, মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়েছে টাইপ কিছু থাকার কথা।

শফিক বলল, একটা পেয়েছি। লবণের দাম কিছু কমেছে। আগে ছিল ষাট টাকা কেজি, এখন হয়েছে পঞ্চাশ টাকা কেজি। সরকার স্থলপথে ইন্ডিয়া থেকে লবণ আমদানির নির্দেশ দিয়েছেন।

রাধানাথ বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি তো খুবই খারাপ একটা খবর পড়লে। কক্সবাজার ভর্তি সামুদ্রিক লবণ। অথচ লবণ আনতে হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে। হোয়াট এ শেম! এখন ভালো খবরটা পড়ো।

শফিক বলল, দুটা এক শ' টাকার নোটের ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। নোট দুটার নম্বর এক খবরে বলেছে, বাংলাদেশের কারেন্সি ইন্ডিয়া ছেপে দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, তারা দুই সেট কারেন্সি ছাপে। এক সেট বাংলাদেশকে দেয়, অন্য সেট তারা বাংলাদেশি পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।

রাধানাথ বললেন, এটা তো খুবই ভালো খবর।

ভালো খবর?

অবশ্যই ভালো খবর। বাংলাদেশ সরকার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। ইন্ডিয়ার প্রতি নির্ভরতা কমাবে।

শফিক বলল, আপনার যুক্তি অদ্ভুত, কিন্তু ভালো।

রাধানাথ বললেন, যুক্তিবিদ্যা অতি দুর্বল বিদ্যা, সবদিকে এই বিদ্যা খাটানো যায়। যাই হোক, তুমি চলে যাও, আজ আমি ডিকটেশন দেব না।

আপনার কি শরীর খারাপ?

হুঁ। চোখের যন্ত্রণা বাড়ছে। মনে হয় অন্ধ হওয়ার পথে এগুচ্ছি। এটা ভালো। কীভাবে ভালো?

জগতের রূপ দেখতে হয় চোখ বন্ধ করে। হাছন রাজা তাই বলেছেন, "আঁখি মুঞ্জিয়া দেখো রূপ রে।" জগতের রূপ দেখার জন্য তৈরি হচ্ছি, খারাপ কী? ড্রয়ারটা খোলো।

শফিক ড্রয়ার খুলল।

রাধানাথ ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার চল্লিশ টাকা পাওনা হয়েছে। পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিয়ে যাও। দশ টাকা পরে ফেরত দিয়ে। টিসিবির একটা রসিদ আছে দেখো। রসিদে হয় শার্টের জন্য আড়াই গজ কাপড় দিবে, নয়তো প্যান্টপিস দেবে। রসিদ দেখিয়ে তোমার যেটা প্রয়োজন নিয়ে নিয়ে। এখন বলো, মানুষের সবচেয়ে কঠিন অভাব কোনটা?

খাদ্যের অভাব।

হয় নাই। বস্ত্রের অভাব। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তুমি পথে বের হতে পারবে। ভিক্ষা চাইতে পারবে। নগ্ন অবস্থায় সেটা পারবে না। তোমাকে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হবে।

শফিক বলল, আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

রাধানাথ বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে না গভীর দুঃখে আমি কাঁদছি?

মনে হচ্ছে।

রাধানাথ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ধর্মপাশার একজন সাধুর নাম 'অশ্রুবাবা'। তিনি ভক্তদের দেখলেই চোখের জল ফেলতেন। অশ্রুবাবার নামডাক শুনে একবার তাকে দেখতে গেলাম। তিনি দু'হাতে আমার ডানহাত জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। আমি আবিষ্কার করলাম, তার চোখের কোনো সমস্যার কারণে তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। ভক্তের দুঃখে আপুত হয়ে বা তার প্রতি মমতাবশত অশ্রুবর্ষণ করেন না। তার হাতটা আমার দেখার শখ ছিল। আমি বললাম, বাবা, আপনার হাতটা একটু দেখি। আমি একজন শখের হস্তরেখাবিদ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মুঠো করে চোখমুখ শক্ত করে ফেললেন। অশ্রুবাবা এরকম কেন করলেন জানো?

না।

তিনি নিশ্চয়ই বড় কোনো পাপ করেছেন। তার ধারণা হয়েছিল আমি হাত দেখে সেটা ধরে ফেলব।

শফিক বলল, আপনি আমার হাতটা একদিন দেখে দেবেন না।

রাধানাথ বললেন, না। হাতের রেখায় মানুষের ভাগ্য থাকে না। মানুষের ভাগ্য থাকে কর্মে। তোমার কর্ম তো আমি দেখছি।

শফিক বলল, হাতের রেখা বিশ্বাস করেন না, তাহলে হাত দেখেন কেন?

রাধানাথ বললেন, পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ ভুলের পেছনে কেন ছুটছে, কেন এই বিদ্যার চর্চা এখনো হচ্ছে, তা জানার জন্যে। এখন তুমি বিদায় হও। আজ একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আজকের কথা বলার কোটা শেষ। আজ আর কথা বলব না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

‘অতিভুক্তিরতী বোক্তিঃ
সদ্যঃপ্রাণাপহারিণী’

এর অর্থ—অতিরিক্ত ভোজন এবং অতিরিক্ত বাচালতা সদ্য প্রাণনাশক।

রাধানাথ বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। তিনি চিলেকোঠায় মেঝেতে পাতা শীতলপাটিতে ঘুমান। এই ঘরে কখনো না। এটা অতিথি-অভ্যাগতদের

অভ্যর্থনার ঘর। দেয়ালে যামিনী রায়ের দুটি দুর্লভ ছবি আছে। দুই ছবির মাঝখানে রামকিংকর বেইজের ড্রয়িং। ছবিগুলি যত্নে আছে তা না। যামিনী রায়ের হুক খুলে গেছে বলে তিনি ফাঁস নেওয়ার মতো দেয়ালে ঝুলছেন।

রাধানাথ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমালেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন, তাকে একটা প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গাছভর্তি বিষপিঁপড়া। অর্ধেকটা লাল অর্ধেকটা কালো। বিষপিঁপড়ারা তাঁকে কামড়াচ্ছে। হাত-পা বাঁধা বলে তিনি গা থেকে পিঁপড়া তাড়াতে পারছেন না। আশপাশে কেউ নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে ডাকবেন।

এই স্বপ্নটা তিনি এর আগেও কয়েকবার দেখেছেন। প্রতিবার স্বপ্নেই কিছু পার্থক্য থাকে, কিন্তু মূল বিষয় এক। তিনি গাছের সঙ্গে বাঁধা। পিঁপড়া তাঁকে কামড়াচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা কি আছে? কেউ তাকে কোনো বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাচ্ছে? সেই কেউটা কে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি পিতা? সেই আদি পিতাকে কে সৃষ্টি করেছে? তিনি স্বয়ম্ভু। নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটা কী করে সম্ভব!

রাধানাথ ভ্রু কুঁচকে বসে আছেন। আজ আর চিলেকোঠার প্রার্থনাঘরে যাওয়া হবে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহজনক কোনো চিন্তা মাথায় এলে তিনি অস্থির বোধ করেন। সেদিন আর তার প্রার্থনাঘরে যাওয়া হয় না। এক-দু'দিন সময় লাগে মন ঠিক করতে। মন ঠিক হওয়ার পর জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দরজা খুলে প্রেসের পিয়ন মাথা বের করল। তার চোখে ভয়। সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়লে সে কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে।

কিছু বলবি ফণি?

বাবু, চা দিব?

না।

আপনার কি শরীর খারাপ?

না।

আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসছে। এক ঘণ্টার উপরে হইল বইসা আছেন। আপনার সঙ্গে নাকি বিশেষ প্রয়োজন। আমি কী বলব, আপনি ঘুমে আছেন?

আমি তো ঘুমাচ্ছি না। মিথ্যা বলবি কেন? ঘরে বাতি জ্বালা। ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে আয়।

বাবু, আপনাকে কি লেবুর শরবত বানায়ে দিব?

আচ্ছা দে।

ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল। অত্যন্ত সুপুরুষ। এই সন্ধ্যাবেলাতেও তাঁর চোখে কালো চশমা। রাধানাথের বিছানার কাছে রাখা কাঠের চেয়ারে তিনি মোটামুটি

শক্ত হয়ে বসে আছেন। চেয়ারের হাতলে হাত রাখা, সেই হাতও শক্ত। রাধানাথ বললেন, আমার কাছে কী প্রয়োজন?

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, শুনেছি আপনি খুব ভালো হাত দেখেন। আমি আপনাকে হাত দেখাতে এসেছি।

রাধানাথ বললেন, আমি নিজের শখে মাঝে মধ্যে হাত দেখি। অন্যের শখে দেখি না।

ভদ্রলোক ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। রাধানাথ বললেন, হাত দেখার এই অপবিজ্ঞানে আমার কোনো আস্থা নেই। দুর্বল মানুষ এর পেছনে ছোটে। আপনি দুর্বল হবেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি। দার্জিলিংয়ের চায়ের দুটা প্যাকেট। আপনি উপহার গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।

রাধানাথ বললেন, আমি উপহার গ্রহণ করলাম, কিন্তু আপনার হাত দেখব। প্রেসে ফণি বলে এক কর্মচারী আছে, তার কাছে চায়ের প্যাকেট দিয়ে যান।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার, তাহলে যাই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে লজ্জিত।

রাধানাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, বসুন। দু'হাত মেলুন। তার আগে আমার টেবিলের ড্রয়ারে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে, সেটা আমাকে দিন। সন্ধ্যাবেলা কেউ আমার কাছ থেকে মন খারাপ করে চলে যাবে তা হবে না। সন্ধ্যা হলো বিশ্বপিতার মাহেন্দ্রক্ষণ।

স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।

ছাদ থেকে ঝুলন্ত চল্লিশ ওয়াট বাল্বের আলো রাধানাথের জন্যে যথেষ্ট না। রাধানাথ ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে ঝুঁকে আছেন। তাঁর চোখও সমস্যা করছে। রুমালে বারবার চোখ মুছতে হচ্ছে।

আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন। জবাব দিলেন না। রাধানাথ বললেন, নাম বলতে কি সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলতে হবে না। নামে কিছু আসে যায়। আসে যায় কর্মে। যিশুখ্রিষ্টকে বিশুব্রিষ্ট ডাকলেও তার যিশুত্ব কিছুমাত্র কমবে।

আমার নাম ফরিদ।

রাধানাথ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আসল নাম গোপন করলেন, তাই না? ফরিদ নামেও চলবে। আপনি সেনাবাহিনীতে আছেন? আপনার হাভভাব, চোখের কালো চশমায় এরকম মনে হচ্ছে। আপনি সেনাবাহিনীতে আছেন এমন তথ্য হাতে লেখা নেই। অনুমানে বললাম।

আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম, এখন নেই।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

হুঁ।

খেতাবধারী?

হুঁ।

কতক্ষণ আর হুঁ হুঁ করবেন? দু'-একটা কথা বলুন শুনি। কী খেতাব পেয়েছেন? হাত দেখে মনে হচ্ছে বড় খেতাব। বীরউত্তম নাকি?

আপনার অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। ফাঁসিতে মৃত্যু। বিশেষ আর কিছু জানতে চাইলে কুষ্ঠি তৈরি করতে হবে। চা খাবেন?

না।

আপনি সাহসী, একরোখা, জেদি এবং নির্বোধ। আপনার সুবিধা হচ্ছে, নিজের নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে আপনি জানেন, অন্যরা জানে না। যদি সম্ভব হয় একটা রত্ন ধারণ করবেন। রত্নের নাম গোমেদ, ইংরেজিতে বলে গার্নেট। দশ রতির মতো হলেই চলবে।

আপনার এখানে পাওয়া যায়?

না। আমি রত্নব্যবসা করি না।

রত্ন কোথায় পাওয়া যাবে?

ঢাকায় পাবেন না। কলকাতা থেকে সগ্রহ করলে ভালো হয়।

রাধানাথের চোখের যন্ত্রণা হঠাৎ অনেকখানি বাড়ল। তিনি রুমালে চোখ ঢাকতে ঢাকতে বললেন, আপনি কি বিশেষ কিছু জানতে চান?

যুবক ইতস্তত করে বললেন, মানুষের ভাগ্য কি পূর্বনির্ধারিত?

রাধানাথ বললেন, এই জটিল প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পূর্বনির্ধারিত। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় নেকলেসের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।

আপনি কোরানশরিফ পড়েছেন?

অনুবাদ পড়েছি।

আগন্তুক বলল, আপনার দেয়ালে অতি মূল্যবান কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি।

রাধানাথ বললেন, এই পৃথিবীতে মূল্যবান শুধু মানুষের জীবন, আর সবই মূল্যহীন।

আগন্তুক দার্শনিক কথাবার্তার দিকে না গিয়ে বলল, ছবিগুলি অযত্নে আছে। ধুলা মাকড়শার ঝুল। আমি কি আপনার প্রেসের ছেলে ফণিকে বলে ঠিক করে দিয়ে যাব?

না।

আপনার কাছে নাম গোপন করেছিলাম বলে দুঃখিত। আমার নাম শরিফুল হক। আচ্ছা জনাব, যাই।

ডাকনাম ডালিম?

আমাকে ডালিম নামেই বেশির ভাগ চেনে।

আপনি তাহলে ডালিম কুমার?

যুবক জবাব দিলেন না। রাধানাথ কোনো কারণ ছাড়াই খানিকটা অস্থির বোধ করলেন। যুবক কি তার নিজের অস্থিরতা খানিকটা তাকে দিয়েছে। এই সম্ভাবনা আছে। মানুষ চুম্বকের মতো। একটি চুম্বক যেমন পাশের চুম্বককে প্রভাবিত করে, মানুষও করে।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। শুক্রবার। ভোরবেলা বাংলাদেশ বেতার থেকে ডালিমের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এই যুবক আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল, ‘আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ল’ জারি করা হলো।’

এই প্রসঙ্গ আপাতত থাক। যথাসময়ে বলা হবে। দুঃখদিনের গাথা একসঙ্গে বলতে নেই। ধীরে ধীরে বলতে হয়।

রাত আটটা।

শফিক অবন্তির পড়ার ঘরে বসে আছে। তাকে চা দেওয়া হয়েছে, সে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। অবন্তি এখনো আসে নি। তার দাদা সরফরাজ খান একটা বই হাতে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। শফিক কখনো তাকে অবন্তির পড়ার ঘরে দেখে নি।

সরফরাজ বললেন, মাস্টার, তোমার ছাত্রীর পড়াশোনা কেমন চলছে?

শফিক বলল, ভালো।

সরফরাজ বললেন, গৃহশিক্ষক বিষয়টাই আমার অপছন্দ। আইন করে গৃহশিক্ষকতা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেন জানো?

জি-না।

ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিজেরা কিছু বুঝতে চায় না। কষ্ট করতে চায় না। আমার কথায় যুক্তি আছে না?

জি আছে।

সরফরাজ বললেন, নৈতিকতার বিষয়ও আছে। ছাত্রীরা প্রেম শেখে গৃহশিক্ষকের কাছে। তোমাকে কিছু বলছি না। তুমি আবার কিছু মনে কোরো না। আমি ইন-জেনারেল বলছি। গৃহশিক্ষক ও ছাত্রীর প্রেম কোথায় শুরু হয় জানো?

শফিক অস্বস্তির সঙ্গে বলল, না।

শুরু হয় টেবিলের তলায় পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি থেকে। তারপর বই লেনদেন। বইয়ের পাতার ভেতরে চিঠি।

সরফরাজ হয়তো আরও কিছু বলতেন, তার আগেই অবন্তি ঢুকল। সে অবাক হয়ে বলল, দাদাজান, তুমি এখানে কেন?

সরফরাজ বললেন, আমি এখানে থাকতে পারব না?

না। তুমি থাকবে তোমার ঘরে।

মাস্টার তোকে কীভাবে পড়ায় দেখি। একেকজনের পড়ানোর টেকনিক একেক রকম। শফিকের টেকনিকটা কী জানা দরকার।

অবন্তি বলল, কোনো দরকার নেই। তা ছাড়া আজ আমি পড়ব না। স্যারের সঙ্গে গল্প করব।

গল্প করবি? সবদিন পড়তে ভালো লাগে না। তখন গল্প করতে হয়।

সরফরাজ বললেন, কী গল্প করবি আমিও শুনি। শ্রোতা যত ভালো হয় গল্প তত জমে।

অবন্তি বলল, দাদাজান, আমি একেকজনের সঙ্গে একেক ধরনের গল্প করি। তুমি ওঠো তো।

সরফরাজ উঠে দাঁড়ালেন। অবন্তি বলল, যাওয়ার সময় দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যাবে এবং অবশ্যই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

সরফরাজ বিড়বিড় করে কিছু বললেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না। অবন্তি শফিকের সামনে বসতে বসতে বলল, দাদাজানের স্বভাব মাছির মতো। খুব বিরক্ত করতে পারেন।

শফিক জবাব দিল না। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সে ব্রিত বোধ করছে। সে তার দুই পা যথাসম্ভব ভেতরের দিকে টেনে বসেছে। মনে করার চেষ্টা করছে—কখনো কি অবন্তির পায়ের সঙ্গে তার পা লেগেছে?

অবন্তি কালো রঙের চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বসেছে। সে ব্যাগ খুলে পারফিউমের শিশি টেবিলে সাজাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শফিক। অবন্তি বলল, স্যার, এখানে ষোলটা শিশি আছে। আপনি প্রতিটি পারফিউমের গন্ধ শুকবেন, তারপর বলবেন সবচেয়ে সুন্দর গন্ধ কোনটা, সবচেয়ে কম ভালো গন্ধ কোনটার।

শফিক বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

অবন্তি বলল, আমার ষোলতম জন্মদিন উপলক্ষে আমার মা ষোলটা পারফিউম পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কোনটার গন্ধ আমার সবচেয়ে ভালো লাগল।

শফিক বলল, উনি নিশ্চয়ই জানতে চান নি আমার কোনটা ভালো লাগল।

অবন্তি বলল, উনি জানতে চান নি, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা স্যার, আপনি কি জার্মান ভাষা জানেন?

শফিক বলল, বাংলা ভাষাই ঠিকমতো জানি না, জার্মান কীভাবে জানব? কেন বলো তো?

অবন্তি বলল, আমি একটা লেখা লিখেছি। আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। আমি এই লেখাটা আমার মাকে পড়াতে চাই। মা স্প্যানিশ ও জার্মান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। তিনি যখন আমাকে চিঠি লেখেন তখন সেই চিঠি কাউকে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে দেন। অবশ্য মূল চিঠি সবসময় সঙ্গে থাকে।

শফিক বলল, আমার পরিচিত একজন আছেন, নাম রাধানাথ। তিনি পৃথিবীর অনেক ভাষা জানেন। বিরাট পণ্ডিত মানুষ। তবে জার্মান ভাষা জানেন কি না আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নেব।

অবন্তি বলল, চুপ করে বসে থাকবেন না স্যার, গন্ধ পরীক্ষা শুরু করুন। ভালো কথা, আপনি কি বাসি পোলাও খান? আমার জন্মদিনে একগাদা খাবার রান্না করা হয়েছে। শুধু একজন গেস্ট এসেছে, আর কেউ আসে নি। আপনাকে কি টিফিন ক্যারিয়ারে করে কিছু খাবার দিয়ে দেব?

শফিক বলল, দাও। একটা পেন্সিল দিতে পারবে?

পারব। পেন্সিল দিয়ে কী করবেন?

শফিক ইতস্তত করে বলল, তোমার একটা ছবি আঁকব। পেন্সিল পোর্ট্রেট।

আপনি পোর্ট্রেট করতে পারেন?

পারি।

কোত্থেকে শিখেছেন?

নিজে নিজেই শিখেছি। কিছু বিদ্যা আছে মানুষের ভেতর থাকে। সে নিজেও তা জানে না।

অবন্তি আগ্রহ নিয়ে পেন্সিলের সন্ধানে গেল।

শফিক কাদেরের চায়ের দোকানে বসা। টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে শফিক চায়ের দোকানে এসেছে। দুজনেই আগ্রহ করে নিঃশব্দে খাচ্ছে।

কালাপাহাড়কেও খাবার দেওয়া হয়েছে। সে পোলাও খাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে আরামে মাংসের হাড় চিবাচ্ছে। কাদের বলল, ভাইজান, আপনি আজিব মানুষ।

শফিক বলল, আজিব কেন?

খানা নিয়া আমার এইখানে চইলা আসলেন! আমি আপনের কে বলেন? কেউ না। ভাইজান, এত আরাম কইরা অনেকদিন খানা খাই না। আমি আপনেরে দেশের বাড়িতে নিয়া যাব।

গ্রামের নাম তালতলি, কেন্দুয়া থানা। আমার স্ত্রী বেগুন দিয়া টেংরা মাছের একটা সালুন রান্ধে। এমন স্বাদের সালুন বেহেশতেও নাই। আপনেরে খাওয়াব। আমার সাথে দেশের বাড়িতে যাবেন না?

শফিক বলল, যাব।

কাদের বলল, আপনের সঙ্গে আমি ভাই পাতাইলাম। আইজ থাইকা আপনে আমার ছোটভাই। আমি খুবই গরিব মানুষ। ভাইয়ে-ভাইয়ে আবার ধনী-গরিব কী? ঠিক না ছোটভাই?

শফিক হাসল।

সরফরাজ খান একদৃষ্টিতে তার হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাগজে পেন্সিলে এক পরী আঁকা হয়েছে। পরীর নাম অবন্তি। পেন্সিলে আঁকা একটা ছবি এত সুন্দর হয়! তাও সম্ভব। অবন্তিকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! দুষ্টুমি করে সে নিচের ঠোঁট সামান্য বাঁকা করে রেখেছে। তাও বোঝা যাচ্ছে।

যে মাস্টার এত সুন্দর ছবি আঁকে সে শয়তানের ঘনিষ্ঠ স্বজন ছাড়া কিছু না। ছবি আঁকা বিদ্যা দিয়ে সে নিশ্চয়ই মেয়েদের ভুলায়, এটা বোঝাই যাচ্ছে। মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে হালকা জিনিস নিয়ে মাতামাতি করা। যে ছবি ক্যামেরায় তোলা যায় সেই ছবি পেন্সিলে আঁকার কিছু নেই। বদের হাড্ডি।

সরফরাজ খান সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন—মাস্টারের চাকরি শেষ। পত্রপাঠ বিদায়। ছবিটাও নষ্ট করে ফেলতে হবে।

অবন্তি তার দাদাজানের পাশে এসে দাঁড়াল। সরফরাজ খান ছবি নামিয়ে রাখলেন। অবন্তি বলল, টাসকি খেয়েছ দাদাজান?

টাসকি আবার কী?

টাসকি হচ্ছে কোনো-একটা জিনিস দেখে ঘাবড়ে যাওয়া। তুমি কি ছবি দেখে টাসকি খেয়েছ?

টাসকি খাওয়ার মতো কোনো ছবি না।

দাদাজান, তুমি হিংসা করছ।

আমি হিংসা করছি? গরুর নাদিকে আমি হিংসা করব?

গরুর নাদি বলছ কেন?

যে যা আমি তাকে তা-ই বলি।

আমার স্যার গরুর নাদি?

ইয়েস।

চিন্তাভাবনা করে বলছ, নাকি আমাকে রাগানোর জন্যে বলছ?

চিন্তাভাবনা করেই বলছি।

দাদাজান শোনো। আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না।

কোথায় যাবে?

আমি আমার স্বামীর কাছে চলে যাব।

কার কাছে চলে যাবি?

স্বামীর কাছে। To my beloved husband,

সরফরাজ খান কঠিন চোখে অবন্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। অবন্তিও তাকিয়ে আছে, তবে অবন্তির মুখ হাসি হাসি।

সরফরাজ উঠে দাঁড়ালেন। অবন্তি বলল, কোথায় যাচ্ছ?

সরফরাজ বললেন, ঘুমাতে যাচ্ছি। আর কোথায় যাব

আমার ছবি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ছবি রেখে যাও। এই ছবি আমি বাধিয়ে আমার শোবার ঘরে রেখে দেব।

সরফরাজ খান বিরক্ত গলায় বললেন, বাড়াবাড়ি করিস না। কোনোকিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি করা ঠিক না।

অবন্তি বলল, এই কথা তোমার জন্যেও প্রযোজ্য। তুমিও কোনোকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না।

সরফরাজ বিছানায় শুয়েছেন। তার হাতে ইছামতি বই। বইটা পড়ে কোনো আরামই পাচ্ছেন না। জটিল ভাষা। অর্থহীন কথাবার্তা। তারপরেও বই শেষ করতে হবে। নিশ্চয়ই বইয়ের কোথাও-না-কোথাও বদ মাস্টার কোনো ইশারা দিয়েছে। পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করেছে।

সরফরাজ ইছামতি পড়ছেন—

রাজারামের ভগ্নি তিনটির বয়স যথাক্রমে ত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ। তিলুর বয়স সবচেয়ে বেশি বটে, কিন্তু তিন ভগ্নির মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দেখতে ভালো, এমনকি তাকে সুন্দরী শ্রেণীর মধ্যে সহজেই ফেলা যায়। তিলুর মধ্যে পাকা সবরি কলার মতো একটু লালচে ছোপ থাকায় উনুনের তাতে কিংবা গরম রৌদ্রে মুখ রাঙা হয়ে উঠলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। তন্বী, সুঠাম, সুকেশী—বড় বড় চোখ, চমৎকার হাসি। তিলুর দিকে একবার চাইলে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। সরফরাজ বই বন্ধ করলেন। মাস্টারের ব্যাপারটা এখন বোঝা যাচ্ছে। অবন্তি হচ্ছে তার তিলু। আরও কিছুদূর এগুলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। দেখা যাবে তিলু প্রেমে পড়েছে তার গৃহশিক্ষকের। এই গৃহশিক্ষক আবার পেন্সিল দিয়ে

ছবি আঁকতে পারে। সরফরাজ মনে মনে বললেন, হারামজাদা! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখো নি। তুমি আমাকে চেনো না। আমি সরফরাজ খান। দাঁড়াও, তোমার শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা করছি, বইটা আগে শেষ করি।

সরফরাজ পাঠে মন দিলেন–

তবে তিলু শান্ত পল্লীবালিকা, ওর চোখে যৌবন চঞ্চল কটাক্ষ নেই, বিয়ে হলে এতদিন ছেলেমেয়ের মা ত্রিশ বছরের অর্ধপ্রৌঢ়া গিন্নি হয়ে যেত তিলু। বিয়ে না হওয়ার দরুণ ওদের তিন বোনই মনেপ্রাণে এখনো সরলা বালিকা। আদরে আবদারে, কথাবার্তায়, ধরন ধারণে সব রকমেই।

দরজায় খটখট শব্দ হচ্ছে। হাতের বই নামিয়ে সরফরাজ বললেন, কে?

অবন্তি বলল, তোমার জন্যে পান আর চা নিয়ে এসেছি।

সরফরাজ বললেন, ফরগেট ইট!

অবন্তি বলল, দরজাটা খোলো। তোমার টেবিলে রেখে যাই, তারপর তুমি ফরগেট ইট' করে ফেলবে।

সরফরাজ দরজা খুললেন। অবন্তি পান আর চা নামিয়ে রেখে মিষ্টি করে হাসল। সরফরাজ বিরক্ত মুখে বললেন, হাসছিস কেন? হাসি বন্ধ।

অবন্তি বলল, তোমার হাসতে ইচ্ছা না করলে হাসবে না। তবে আমার এই হেসে যাওয়াতেই আনন্দ।

কী বললি?

বললাম, আমার হেসে যাওয়াতেই আনন্দ।

এর মানে কী?

অবন্তি বলল, খুব সহজ মানে দাদাজান। কেউ হেসে আনন্দ পায়। কেউ কেঁদে আনন্দ পায়। আনন্দটাই প্রধান। হাসা বা কাঁদাটা কোনো ব্যাপার না।

সরফরাজ বললেন, সারাক্ষণ এমন উদ্ভট কথা কেন বলিস?

অবন্তি বলল, আমার এই উদ্ভট কথাতেই আনন্দ।

রাগ করতে গিয়েও সরফরাজ খান রাগ করতে পারলেন না। হেসে ফেললেন।

অবন্তি বলল, দাদাজান, তুমি যখন হাসো তখন তোমাকে কী সুন্দর যে লাগে! অথচ তুমি সারাক্ষণ মুখটাকে রামগরুড়ের ছানা করে রাখো।

রামগরুড়ের ছানা আবার কী?

অবন্তি বলল, যাদের হাসতে মানা, তারাই রামগরুড়ের ছানা। দাদাজান, গুড নাইট স্লিপ টাইট।

৩. অবন্তির লেখা

অবন্তির লেখা

আমার দাদাজান সরফরাজ খান পুলিশের এসপি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আমি আমার জীবনে তার মতো ভীতু মানুষ দেখি নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তিনি অসীম সাহসিকতার জন্য পিপিএম' পেয়েছিলেন। পিপিএম হলো পাকিস্তান পুলিশ মেডেল। পুলিশ সার্ভিসে সাহসিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার।

আমি দাদাজানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী জন্যে এত বড় পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন? দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট! এই বাক্যটি তাঁর খুব প্রিয়। কারণে-অকারণে তিনি বলেন, ফরগেট ইট! যেসব প্রশ্নের উত্তরে 'ফরগেট ইট' কিছুতেই বলা যায় না, সেখানেও তিনি এই বাক্য বলেন। উদাহরণ দেই—

আমি একদিন বললাম, দাদাজান, বাজার থেকে মাগুর মাছ এনেছে। মটরশুটি দিয়ে রান্না করবে, নাকি আলু দিয়ে?

দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট!

আমি বললাম, কী ফরগেট করব? মাছ রান্না?

তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবি না।

রান্না তুচ্ছ বিষয়?

স্টপ আর্গুইং।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দাদাজান কথা বলতে পছন্দ করেন না, এই তথ্য পুরোপুরি মিথ্যা। তার আগ্রহ তুচ্ছ বিষয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন।

১৯৭১ সালের মে মাসে দাদাজান আমার জন্যে গোলাপি রঙের বোরকা কিনে আনলেন। কঠিন বোরকা। বাইরে থেকে চোখও দেখা যায় না এমন। চোখের ওপর মশারির মতো জাল। এখানেই শেষ না, বোরকার সঙ্গে কালো হাতমোজা। পায়ের মোজা। দাদাজান আমাকে বললেন, না আমেন্ট, নো তর্ক, নো ডিলে। বোরকা পর। আমি বোরকা পরলাম। দাদাজান বললেন, এখন চল।

আমি বললাম, কোথায় যাব?

সোহাগী যাব। ঢাকা শহরে থাকা যাবে না। মিলিটারি মেরে ফেলবে। এখনই রওনা হব।

সঙ্গে আর কিছু নেব না? দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট! আমি বললাম, দাঁত মাজার ব্রাশও নেব না?

দাদাজান বললেন, বেঁচে থাকলে দাঁত মাজার অনেক সুযোগ পাবি। বেঁচে থাকবি কি না এটাই এখন প্রশ্ন।

ঢাকা শহর আমরা পার হলাম রিকশায় এবং পায়ে হেঁটে। কিছু কিছু বাস ঢাকা থেকে যাচ্ছিল। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া বাসগুলিতে মিলিটারিরা ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছিল। মিলিটারি তল্লাশি মানে কয়েকজনের মৃত্যু। রূপবতী মেয়েদের ধরে আড়ালে নিয়ে যাওয়া তখনো শুরু হয় নি।

ঢাকা থেকে পালানোর সময় রিকশা ছাড়া আর যেসব যানবাহনে আমি চড়েছি সেগুলি হচ্ছে মহিষের গাড়ি, মোটরসাইকেল (শিবগঞ্জ থানার ওসি সাহেব মোটরসাইকেল চালিয়েছেন, তার পেছনে দাদাজান ও আমি বসেছি।) সবশেষে নৌকা। নৌকাও কয়েক ধরনের। এর মধ্যে একটা ছিল বালিটানা নৌকা। এই নৌকায় পাটাতনের নিচে আমাকে দাদাজান লুকিয়ে রাখলেন। যাত্রার পুরো সময়টা তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আমরা একপর্যায়ে মিলিটারির হাতে পড়ব। তারা দাদাজানকে গুলি করে মারবে এবং আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। সেই সময় দাদাজান দিনের মধ্যে অনেকবার অজু করতেন। তিনি চাচ্ছিলেন যেন পবিত্র অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আমরা তিন দিন পর আধামরা অবস্থায় সোহাগী পৌঁছালাম। দাদাজানের বাড়ি সোহাগীতে। বাড়ির নাম 'রঙমহল'। শ্বেতপাথরে কালো রঙ দিয়ে লেখা। 'র'-এর ফোঁটা উঠে যাওয়ায় এখন নাম হয়েছে বঙমহল। নদীর পাড়ে দোতলা দালান। বাবার সঙ্গে এই বাড়িতে আগে আমি দু'বার এসেছি। কিছু কিছু বাড়ি থাকে সাধারণ, সেই সাধারণে লুকিয়ে থাকে অসাধারণ। 'বঙমহল' সেরকম একটি বাড়ি। এই বাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

দাদাজানের এই বাড়ি পুরোনো। দোতলায় টানা বারান্দা আছে। স্টিমারের ডেকে বসলে যেমন সারাক্ষণ প্রবল হাওয়া গায়ে লাগে, বারান্দায় দাঁড়ালেও তা-ই। সারাক্ষণ হাওয়া বইছে। বাড়ির তিনদিকেই ফলের বাগান। লিচুগাছ থেকে শুরু করে তেঁতুলগাছ, সবই সেখানে আছে। দাদাজানের ওই বাড়িতেই আমি জীবনে প্রথম গাছ থেকে নিজ হাতে পেড়ে লিচু খেয়েছি। লিচু মিষ্টি না, টক। লবণ দিয়ে খেতে হয়।

আমাদের বাড়ির সামনের নদীর নাম তরাই। এই নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখা। বর্ষায় পানি হয়। শীতের সময় পায়ের পাতা ভেজার মতো পানি থাকে। সেবার তরাই নদীতে প্রচুর পানি ছিল। জেলেরা সারা দিনই জাল ফেলে মাছ ধরত। তরাই নদীর বোয়াল মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। জেলেরা ভোরবেলায় মাছ দিয়ে যেত। নানান ধরনের মাছ। কৈ, সরপুঁটি, ট্যাংরা, খইলসা। মাঝে মাঝে মাঝারি সাইজের কাতল। সেবারই আমি কাতল মাছের আস্ত মাথা খাওয়া শিখি। রান্না করতেন ধীরেন কাকু। উনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। দাদার বাড়ির আশপাশে প্রচুর আত্মীয়স্বজন থাকার কথা। তা ছিল না। কারণ দাদাজানের বাবা (খালেক মুনশি) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে এই বাড়ি করেছিলেন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তার উপায় ছিল না। তিনি তাঁর বড়ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ওই মহিলার ছবি আমি দেখেছি। তিনি ছিলেন কদাকার। উঁচু হনু। দাঁত বের হওয়া। গায়ের রঙ পাতিলের তলার মতো কালো। কী দেখে তিনি এই মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন তা এখন আর জানার উপায় নেই।

দাদাজানের বাড়িতে কেয়ারটেকার সেন কাকা ছাড়াও ছিলেন ধীরেন কাকার স্ত্রী রাধা। উনি রূপবতী ছিলেন। আমি লক্ষ করেছি, রাধা নামের সব মেয়েই রূপবতী হয়। রাধা

কাকি সারাক্ষণই বাড়ি পরিষ্কার রাখার কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন। এই দুজন ছাড়াও দবির নামের মধ্যবয়স্ক একজন ছিলেন, যার কাজ গাছপালা দেখা, বাগান করা।

বঙমহলে আমার সময় খুব ভালো কাটছিল। আমি বাগানে দবির চাচাকে দিয়ে দোলনা টানিয়েছিলাম। দোলনায় দুলতে দুলতে গল্পের বই পড়তাম। দাদাজানের লাইব্রেরিতে চামড়ায় বাঁধানো অনেক বই ছিল। বেশির ভাগই গ্রন্থাবলি। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাস আমি দাদাজানের বাগানের দোলনায় দুলতে দুলতে পড়েছি।

ধীরেন কাকা আমাকে রান্না শেখাতেন। অধ্যাপকের ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিয়ে রান্না শেখানো। এই সময় রাধা কাকি তার পাশে থাকতেন। রান্নার বক্তৃতা শুনে মিটিমিটি হাসতেন। ধীরেন কাকার রান্না-বিষয়ক বক্তৃতামালা।

মা! সবচেয়ে কঠিন রান্না হলো মাছ রান্না। মাছের আছে আঁশটে গন্ধ। রান্নার পর যদি মাছের আঁশটে গন্ধ থাকে, তখন সেই মাছ হয় ভূত-পেত্নির খাবার। প্রথমেই আঁশটে গন্ধ দূর করবে।

এ কাজ কীভাবে করা হবে?

প্রথমে লবণ মেখে কচলাবে। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে লবণ ফেলে দেবে। এরপর দেবে লেবুর রস। কাগজিলেবু হলে ভালো হয়। এই লেবুর গন্ধ কড়া। লেবুর রস দিয়ে মাখানোর পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে দেবে। সব মিলিয়ে তিন ধোয়া। এর বেশি না। মাংসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা। মাত্র এক ধোয়া।

রান্নাবিষয়ে ধীরেন কাকার সব কথা আমি একটা রুলটানা খাতায় খুব গুছিয়ে লিখেছিলাম। খাতাটা হারিয়ে গেছে। খাতাটা থাকলে রান্নার একটা বই লেখা যেত। তবে কৈ মাছ রান্নার একটা রেসিপি আমার মনে আছে। রেসিপিটা এ রকম—

একটা কৈ মাছ সরিষা বাটা, লবণ এবং একটা ঝাল কাঁচামরিচ দিয়ে মাখিয়ে কলাপাতায় মুড়ে ভাতের মাড় ফেলা অবস্থায় হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া। ব্যস হয়ে গেল।

রাধা কাকি ছিলেন ভূতের গল্পের ওস্তাদ। তাঁর কাছ থেকে কত যে গল্প শুনেছি! বেশির ভাগ গল্পই বাস্তব অভিজ্ঞতার। তিনি নিজে দেখেছেন এমন। তাঁর কথায় সব ভূত ভীতুপ্রকৃতির। মানুষের ভয়ে তারা অস্থির থাকে। শুধু একশ্রেণীর পিশাচ আছে, যারা মানুষকে মোটেই ভয় পায় না। এরা হিংস্র জন্তুর মতো।

আমি বললাম, কাকি, আপনি এই ধরনের পিশাচ দেখেছেন?

কাকি বললেন, একবার দেখেছি। ঘটনা বলি শোনো, আমি এই বাড়ির বারান্দায় বসা। সন্ধ্যা মিলিয়েছে, আমি বড়ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে বারান্দায় এসেছি, তখন দেখলাম পানির নিচ থেকে পিশাচটা উঠল। থপ থপ শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে উঠানে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে ঘোড়ার মত শব্দ করল।

দেখতে কেমন?

মানুষের মতো। মিশমিশা কালো। হাতের আঙুল অনেক লম্বা। আঙুলে পাখির নখের মতো নখ। পিশাচটা দেখে ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি—এই সময় একটা কুকুর ছুটে এল। কুকুর দেখে পিশাচটা ভয় পেয়ে দৌড়ে পানিতে নেমে ডুব দিল। পিশাচরা কিছুই ভয় পায় না, শুধু কুকুর ভয় পায়। কুকুর তাদের কাছে সাক্ষাৎ যম।

দাদাজানের সঙ্গে আমার তেমন কথা হতো না। তিনি সারাক্ষণ ট্রানজিস্টারে খবর শুনতেন। মাঝে মাঝে তিন মাইল দূরে হামিদ কুতুবি নামের এক পীর সাহেবের আস্তানায় যেতেন। তিনি এই পীরের মুরিদ হয়েছিলেন। যখন ট্রানজিস্টার শুনতেন না, তখন পীর সাহেবের দেওয়া দোয়া জপ করতেন। দাদাজান আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। প্রতিদিনই তাঁর আতঙ্ক বাড়ছিল। রাতে তিনি ঘুমুতে পারতেন না। সারা রাত বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকতেন। ভবিষ্যৎ জানার জন্যে তিনি এক রাতে ইস্তেখারা করলেন। ইস্তেখারায় দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ধবধবে সাদা পাখি যার চোখ টকটকে লাল, সে আকাশ থেকে নেমে আমার চুল কামড়ে ধরে আকাশে উঠে গেছে। আমি চিৎকার করছি, বাঁচাও! বাঁচাও! দাদাজান আমাকে বাঁচাও। দাদাজান আমাকে বাঁচানোর জন্যে হেলিকপ্টারে করে উঠে গেলেন। সেই হেলিকপ্টার আবার চালাচ্ছে একজন পাকিস্তানি পাইলট। হেলিকপ্টার চালাবার ফাকে ফাকে সে পিস্তল দিয়ে পাখিটাকে গুলি করছে। কোনো গুলি পাখির গায়ে লাগছে না। লাগছে অবন্তির গালে।

দাদাজানের পীর হামিদ কুতুবি স্বপ্নের তাবীর করলেন। কী তাবীর তা দাদাজান আমাকে বললেন না, তবে তিনি আরও অস্থির হয়ে পড়লেন। চারদিক থেকে তখন ভয়ংকর সব

খবর আসতে শুরু করেছে। মিলিটারিরা গানবোট নিয়ে আসছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নির্বিচারে মানুষ মারছে, অল্পবয়সী মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এইসব।

একসময় আমাদের অঞ্চলে মিলিটারি চলে এল। খাতিমনগরে মিলিটারির গানবোট ভিড়ল। দাদাজানের বাড়ি থেকে খাতিমনগর বাজার দু'মাইল দূরে। খবর শোনামাত্র দাদাজান আমাকে নিয়ে তাঁর পীর সাহেবের হুজরাখানায় উপস্থিত হলেন।

বিশাল এলাকাজুড়ে পীর সাহেবের হুজরাখানা। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালের ওপর কাটাতার। দুর্গের মতো ব্যাপার। হুজরাখানার ভেতরে দুটি মাদ্রাসা আছে। একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। দুটিই হাফেজি মাদ্রাসা। কোরানশরিফ মুখস্থ করানো হয়। হুজরাখানার পেছনে পীর সাহেবের দোতলা বাড়ি। একতলায় থাকেন পীর সাহেবের প্রথম স্ত্রী। তার কোনো সন্তানাদি নেই। দোতলায় থাকেন পীর সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর নাম জুলেখা। এই স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান আছে। তাঁর নাম জাহাঙ্গীর। তিনি কোরানে হাফেজ। রূপবান এক যুবক। স্র এবং ভদ্র। মেয়েদের মতো চোখে গাঢ় করে কাজল দেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। তিনি কখনো মাথা তুলে তাকান নি। হুজরাখানার পুরুষদের মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর নিয়ম নেই।

আমি পীর সাহেবের সামনে বসে আছি। আমার পাশে দাদাজান। পীর সাহেব নামাজের ভঙ্গিতে বসেছেন। তার বয়স অনেক, তবে তিনি শারীরিকভাবে মোটেই অশক্ত না। পীর সাহেবের ডানহাতে তসবি। তসবির দানাগুলি নীল রঙের, অনেক বড় বড়। তিনি একমনে তসবি টেনে যাচ্ছেন। ঘরে আরও কয়েকজন ছিল, তাদের হাতেও তসবি। পীর সাহেবের

নির্দেশে তারা বেরিয়ে গেল। একজন এসে ফরসি হুক্কা দিয়ে গেল। পীর সাহেব হুক্কায় টান দিতে দিতে বললেন, সরফরাজ! তোমার এই নাতনির মা বিদেশিনী, সেটা জানলাম। তার ধর্ম কী?

খ্রিষ্টান। ক্যাথলিক খ্রিষ্টান।

পীর সাহেব বললেন, মুসলমান ছেলে খ্রিষ্টান বিবাহ করতে পারে। নবিজি মরিয়ম নামের এক খ্রিষ্টান কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তার গর্ভে এক পুত্রসন্তানও হয়েছিল। সন্তানের নাম ইব্রাহিম। এখন আমার প্রশ্ন, তোমার পুত্রের সঙ্গে খ্রিষ্টান মেয়ের বিবাহ কি ইসলাম ধর্মমতে হয়েছে?

জি হুজুর।

আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা সুসংবাদ। তুমি তোমার নাতনিকে আমার এখানে রাখতে চাও?

জি জনাব।

মেয়ের বাবা কোথায়?

মেয়ের বাবা কোথায় আমি জানি না। আমার ছেলে তিন বছর বয়সের মেয়েকে এনে আমার কাছে রেখে স্পেনে চলে যায়। এরপর আর তার খোঁজ জানি না।

সে কি জীবিত আছে?

তাও জানি না।

পীর সাহেব বললেন, জ্বিনের মাধ্যমে তোমার পুত্রের সংবাদ আমি এনে দিতে পারি। সেটা পরে দেখা যাবে। এই মেয়ের নাম কী?

অবন্তি।

এটা কেমন নাম?

তার বাবা রেখেছে।

সন্তানের সুন্দর ইসলামি নাম রাখা মুসলমানের কর্তব্য। আমি এই মেয়ের নাম রাখলাম, মায়মুনা! মায়মুনা নামের অর্থ ভাগ্যবতী।

দাদাজান চুপ করে রইলেন।

পীর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি কোরানমজিদ পাঠ করতে পারো?

আমি বললাম, পারি। কে শিখিয়েছে? তোমার খ্রিষ্টান মা?

না। আমার দাদাজান আমার জন্যে একজন হুজুর রেখে দিয়েছিলেন। হুজুরের নাম বলব?

পীর সাহেব বললেন, নাম বলতে হবে না। তুমি কথা বেশি বলো। কথা কম বলবে। তোমার অজু আছে?

জি-না।

যাও, অজু করে এসে আমাকে কোরানমজিদ পাঠ করে শোনাও। সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে।

আমি সূরা ইয়াসিন পড়লাম। পীর সাহেব বললেন, পাঠ ঠিক আছে। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। সরফরাজ, তোমার নাতনি মায়মুনাকে আমি জুলেখার হাতে হাওলা করে দিব। সে নিরাপদে থাকবে। তবে তাকে কঠিন পর্দার ভেতর থাকতে হবে। আমার এখানে তা-ই নিয়ম।

দাদাজান বললেন, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই সে থাকবে।

পীর সাহেবের কাছে থাকার সময়ই খবর পেলাম, দাদাজানের বাড়িতে মিলিটারি এসে উঠেছে। মিলিটারি ক্যাপ্টেন ঘাঁটি হিসেবে বাড়ি পছন্দ করেছেন। তাদের নিরাপত্তার জন্যে বাড়ির চারদিকের সব গাছপালা কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধীরেন কাকা ও তার স্ত্রীকে যে মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছেএই খবর তখনো আসে নি।

দাদাজান আমাকে রেখে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আমার হাতে এক শ’ টাকার নোটে দুই হাজার টাকা দিলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আমার ব্যক্তিগত পিস্তলটা তোকে দিয়ে যাচ্ছি। ভালো করে দেখে নে। বারো

রাউন্ড গুলি ভরা আছে। সেফটি ক্যাচ লাগানো অবস্থায় ট্রিগার চাপলে গুলি হবে না। সেফটি ক্যাচ কীভাবে খুলতে হয় দেখ। এইভাবে।

আমি বললাম, সেফটি ক্যাচ খেলার কায়দা জেনে আমি কী করব? কাকে আমি গুলি করে মারব?

দাদাজান বললেন, কাউকে মারবি না। জিনিসটা জানা থাকল।

আমি বললাম, তুমি কোথায় যাবে?

দাদাজান বললেন, জানি না কোথায় যাব। ঢাকায় যেতে পারি।

মিলিটারিরা তোমার বাড়ি দখল করে বসে আছে। তাদের কিছু বলবে না?

না।

পীর সাহেবের এই বাড়িতে আমি কত দিন থাকব?

মলিটারির গুষ্টি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত থাকবি। আমি মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ নিব। পিস্তলটা লুকিয়ে রাখবি। পিস্তলের বিষয়টা কেউ যেন না জানে।

কেউ জানবে না।

পীর সাহেবের বাড়িতে আমার জীবন শুরু হলো। খুব যে কষ্টকর জীবন তা না। দোতলার সর্বউত্তরের একটা ছোট্ট ঘর আমাকে দেওয়া হলো। ঘরে একটাই জানালা। এই জানালা দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। জানালার সামনেই বটগাছের সাইজের এক কড়ইগাছ। ঘরে আমি একা থাকি। শুধু রাত্রে সালমা নামের মধ্যবয়স্ক এক দাসী মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমায়। তার চেহারা কদাকার। মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ নষ্ট। মানুষ হিসেবে সে অসাধারণ, মানসিক সৌন্দর্যের কাছে তার শারীরিক ত্রুটি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল। প্রথম রাতেই সে আমাকে বলল, আম্মাজি, আপনি ভয় খাইয়েন না। আমি আছি।

আমি বললাম, ভয় পাব কী জন্যে?

সালমা বলল, আপনের বয়স অল্প। আপনে হুরের মতো সুন্দর। কিংবা কে বলবে, হুরের চেয়েও সুন্দর। আমি তো আর হুর দেখি নাই। আপনের মতো মেয়েছেলের কাইকে কাঁইকে (কদমে কদমে) বিপদ। আপনে সাবধানে চলবেন। আমার একটাই নয়ন। এই নয়ন আপনের উপর রাখলাম।

আমি বললাম, একটা নয়ন আমার উপর রেখে দিলে কাজকর্ম করবেন কীভাবে? তারচেয়েও বড় কথা, নয়ন আপনি আমার উপর রাখছেন কী জন্যে?

সালমা বলল, ছোট মা'র হুকুম।

ছোট মা হলো পীর সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর নাম জুলেখা বিবি। তাঁর একটিই সন্তান, জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর কোরানে হাফেজ। জুলেখা বিবি আরামে ও আলস্যে সময় কাটান। বেশির ভাগ সময় চুল এলিয়ে উবু হয়ে বসে থাকেন। তখন তাঁর গায়ের কাপড় ঠিক থাকে

না। এই নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাও দেখা যায় না। মনে হয় তিনি তাঁর সুন্দর শরীর দেখাতে পছন্দ করেন। তাঁর মতো রূপবতী মেয়ে আমি কম দেখেছি। প্রায় নগ্ন এই মহিলাকে একজন দাসী তার চুলে বিলি করে দেয়। চুলের উকুন বাছে। সপ্তাহে দুদিন বাটা মেন্দি মাথায় দিয়ে দেয়। আরেকজন দাসী তার পায়ের পাতায় তেল ঘষে। এই দাসীরাই তাঁর কাজা নামাজ আদায় করে। রোজার সময় তার হয়ে রোজা রাখে। তিনি নামাজ-রোজা কিছুই করেন না।

এই অদ্ভুত মহিলার ওপর প্রতি অমাবস্যা রাতে কিসের যেন আছর হয়। তখন তিনি জন্তুর মতো গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকেন। তার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। তিনি পুরুষের গলায় বলেন, শইল গরম হইছে। শইল্যে পানি দে। বরফপানি দে। তখন তার গায়ে বালতি বালতি বরফপানি ঢালা হয়। অমাবস্যা উপলক্ষ করেই বরফকল থেকে চাক চাক বরফ কেনা হয়। আছরগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর তিন দাসী ছাড়া অন্য কেউ সামনে যায় না।

পীরবাড়িতে আমার জীবনযাত্রাটা বলি। সূর্য ওঠার আগে সালমা আমাকে ডেকে তোলে। আমাকে ঘাটে নিয়ে যায় গোসল করার জন্যে। ঠান্ডায় গোসলের এই কাজ খুব কষ্টকর। পুকুরভর্তি বালি মাছ। গোসলের সময় এই মাছ সারাক্ষণ গায়ে ঠোকর দেয়। বিশ্রী লাগে।

ফজরের আজানের পরপর নামাজের জন্যে দাঁড়াতে হয়। ইমামতি করেন পীর সাহেব। মেয়েদের ও বারো বছরের নিচের বালকদের আলাদা নামাজের ব্যবস্থা। পুরুষদের নামাজ ও মেয়েদের নামাজ একসঙ্গেই হয়, তবে মাঝখানে দেয়াল আছে। নামাজের সময় মেয়েরা ইমামকে দেখতে পারে না, তবে তার কথা শুনতে পারে।

ফজরের নামাজের পরপর মেয়েরা যে যার ঘরে চলে যায়। এই সময় বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে কোরান পাঠ করতে হয়। সকালে নাশতার ডাক এলে কোরানপাঠ বন্ধ হয়। নাশতা হিসেবে থাকে রাতের বাসি পোলাও ও বাসি মাংস।

জোহরের নামাজের পর দুপুরের খাওয়ার ডাক আসে। দুপুরে গণখাবার রান্না হয়। প্রতিবারই দেড় শ' থেকে দু' শ' মানুষ খায়। বাড়ির মেয়েরা এই খাবার খেতে পারে কিংবা নিজেদের জন্যে মাছ, ডাল, সবজিও খেতে পারে।

এশার নামাজের পর রাতের খাবার। রাতের খাবার পীরবাড়ির বাইরের কেউ খেতে পারে না। জ্বিনেরা রাতের খাবারে অংশগ্রহণ করে বলে (?) রাতে সবসময় পোলাও ও মাংস থাকে। গরুর মাংস না, খাসি কিংবা মুরগি।

জ্বিনেরা নাকি গো-মাংস পছন্দ করে না।

আমি সালমাকে বললাম, জ্বিনেরা রাতে খেতে আসে?

সালমা বলল, সবদিন আসে না, মাঝে মধ্যে আসে। পীর বাবার জ্বিন সাধনা। এই কারণেই আসে। মাসে একবার জ্বিন মিলাদ পড়ায়।

আপনি জ্বিন দেখেছেন?

আমি জ্বিন দেখি নাই, তয় একবার তারার মিলাদে ছিলাম। জ্বিনের ক্যানক্যানা মেয়েছেলের মতো গলা। মিলাদের শেষে জ্বিনমুলুকের তবারক ছিল। সবুজ কিসমিস।

খেতে কেমন?

মিষ্টি, তয় সামান্য ঝালভাবও আছে। আপনে যখন আছেন, তখন জ্বিনের মিলাদ নিজের চউখে দেখবেন। জ্বিনমুলুকের ফলফ্রুট ইনশাল্লাহ খাবেন।

পীর বাবার সঙ্গে এক সন্ধ্যাবেলায় মিলিটারি ক্যাপ্টেন দেখা করতে এলেন। তাঁর নাম সামস আরমান। সবাই ডাকত ক্যাপ্টেন সামস। জ্বিনের মিলাদ দেখার জন্যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পীর বাবা ক্যাপ্টেন সাহেবের আগ্রহ দেখে বিশেষ ব্যবস্থায় জ্বিনের মিলাদের আয়োজন করলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের আগমন উপলক্ষে বিশেষ খাবারের আয়োজন হলো। দুটি খাসি জবেহ করা হলো। খাসির রেজালা, মুরগির রোস্ট এবং পোলাও।

ক্যাপ্টেন সাহেবের উপস্থিতির কারণে জ্বিনের মিলাদে বাড়ির মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারল না। ক্যাপ্টেন সাহেব জ্বিনের মিলাদ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। এরপর থেকে তিনি প্রায়ই পীর বাবার হুজরাখানায় আসতে শুরু করলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের আগ্রহে পীর বাবা খাতিমনগরে শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। হুজরাখানার সবাই খুশি। পাকিস্তানের সেবা করার সুযোগ পাওয়া গেল। এই প্রথম হুজরাখানার মূল গেটে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে লাগল। পতাকাটা অদ্ভুত। পতাকার মাথায় কায়দে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নার বাধাই করা ছবি। তার নিচে পতাকা।

সারা দেশে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। দেশের মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। মিলিটারিরা নির্বিচারে মানুষ মারছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা আছি পরম সুখে। পীর বাবার হুজরাখানা সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত। এখানে প্রতি জুম্মাবারে পাকিস্তানের জন্যে দোয়া হয়, মিলাদ হয়। একবার খবর পাওয়া গেল, জ্বিনেরা বাগাদে বড় পীর সাহেবের মাজারে মিলাদ করেছে। তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন হবে না। দুষ্কৃতিকারীরা সবাই মারা পড়বে। জ্বিনেরা নাকি মানুষের চেয়ে কিছু কিছু বিষয়ে উন্নত। তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পারে।

জুন মাসের আট তারিখ দুপুরে পীর বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। হুজরাখানায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর এক হাতে তসবি, অন্য হাতে হুক্কার নল।

পীর বাবা বললেন, তোমার সঙ্গে কি কখনো পাকিস্তান মিলিটারির ক্যাপ্টেন সামসের দেখা হয়েছে?

আমি বললাম, না।

পীর বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, ভাবনাচিন্তা করে জবাব দাও। তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখেছেন। তুমি আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল।

জি। সালমা ছিল। আমরা পেছনের গেট দিয়ে বাগানে গিয়েছিলাম।

বোরকা ছিল না?

জি-না।

ক্যাপ্টেন সামস তোমাকে দেখেছেন এবং আমার কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তুমি দেশের অবস্থা জানো না। দেশের যে অবস্থা তাতে পাকিস্তানি মিলিটারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

আমি চুপ করে বসে আছি। পীর বাবাও চুপ করে আছেন। তামাক টেনে যাচ্ছেন।

একসময় তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলেছি, এই মেয়েটির আমার ছেলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। মিথ্যা কথা বলেছি। মহাবিপদে জীবন রক্ষার জন্যে মিথ্যা বলা জায়েজ আছে। তোমাকে যে কোথাও পাঠাব সেই উপায় নাই। তোমার পিতা কোথায় আছেন তাও জানি না। এমন অবস্থায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নাই। আগামী শুক্রবারে বাদ জুম্মা তোমার বিবাহ। এখন সামনে থেকে যাও। একটা কথা মনে রাখবা, যা ঘটে আল্লাহপাকের হুকুমেই ঘটে। তার হুকুমের বাইরে যাওয়ার আমাদের কোনো উপায় নাই। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ আল্লাহর হুকুমেই হবে। আমার হুকুমে না।

আমাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হলো। শুক্রবার বাদ জুম্মা দশ হাজার এক টাকা কাবিনে আমার বিয়ে হয়ে গেল। এত দিন জানতাম মেয়ে তিনবার কবুল না বলা পর্যন্ত কবুল হয় না। সেদিন জানলাম লজ্জাবশত যেসব নারী কবুল বলতে চায় না, তারা রেহেলের ওপর রাখা কোরানশরিফ তিনবার স্পর্শ করলেই কবুল হয়।

আমার হাত ধরে জোর করে তিনবার কোরানশরিফ ছুঁইয়ে দেওয়া হলো।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে গেল, আর তখন শুরু হলো নানান ঝামেলা। একদল মুক্তিযোদ্ধা হুজরাখানা লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি করা শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধা নামে একটা দল যে তৈরি হয়েছে, তারা যুদ্ধ শুরু করেছে—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না।

মুক্তিযোদ্ধারা কিছুক্ষণ গুলি করে চলে গেল। তাদের গুলিতে কারও কিছু হলো না, শুধু ইরাজ মিয়া নামের একজনের হাতের কজি উড়ে গেল। সে বিকট চিৎকার শুরু করল, আম্মাজি, আমারে বাচান। আম্মাজি, আমারে বাঁচান। মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে কেউ তাকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল না।

ক্যাপ্টেন সামস জিপে করে দলবল নিয়ে এলেন। মিলিটারিরা আকাশের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়ে চলে গেল।

সে রাতে অমাবস্যা ছাড়াই জুলেখা বিবির ওপর জ্বিনের আছর হলো। আজকের আছর অন্যদিনের চেয়েও ভয়াবহ। তিনি পুরুষের গলায় চেঁচাতে লাগলেন, শইল জ্বইল্যা যায়। বরফপানি দে। বরফপানি দে।

ঘরে বরফ নেই। দাসীরা তার গায়ে কলসি কলসি পানি ঢালতে লাগল। তাতে তার জ্বলুনি কমল না।

একতলার একটা বড় ঘরে পালংকের ওপর আমি বসে আছি। স্বামীর জন্যে অপেক্ষা। এই ঘরেই বাসর হবে। ঘরে আগরবাতি জ্বালানো হয়েছে। বাসরের আয়োজন বলতে এইটুকুই।

আমার স্বামী হাফেজ মোহম্মদ জাহাঙ্গীর এলেন শেষরাত্রে। তাঁকে ব্রিত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে তিনি যেমন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না, এখনো তাকাচ্ছেন না। তিনি খাটে বসতে বসতে কয়েকবার হাই তুললেন। আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম, ইরাজ মিয়ার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। সে কি মারা গেছে?

তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। উনার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।

আমি বললাম, এখন আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আপনি ভয় পাবেন। ভয়ের কিছু নাই। এই দেখুন, এটা একটা পিস্তল। এখানে বারো রাউন্ড গুলি ভরা আছে। সেফটি ক্যাচ লাগানো বলে ট্রিগার টিপলেও গুলি হবে না। এই দেখুন, আমি সেফটি ক্যাচ খুলে ফেললাম। এখন ট্রিগার টিপলেই গুলি হবে।

তিনি এতটাই হতভম্ব হলেন যে, তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। আমি বললাম, এখন আমি যদি গুলি করি তাহলে প্রচণ্ড শব্দ হবে, কিন্তু কেউ এখানে আসবে না। সবাই ভাববে মুক্তিবাহিনী আবার আক্রমণ করেছে।

তুমি গুলি করবে?

আমি বললাম, ভোর হতে বেশি বাকি নেই। আপনি আমাকে যদি লুকিয়ে স্টেশনে নিয়ে ঢাকার ট্রেনে তুলে দেন তাহলে গুলি করব না। যদি রাজি না হন অবশ্যই গুলি করব। এতে মন খারাপ করবেন না। যা ঘটবে আল্লাহর হুকুমেই ঘটবে। আর আপনি যদি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন সেটাও করবেন আল্লাহর হুকুমেই।

তিনি মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আমার হাতে ধরে রাখা পিস্তলের দিকে। তিনি খুব ঘামছেন। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন।

ফজরের আজান হলো। তিনি বললেন, চলো তোমাকে নিয়ে শ্যামগঞ্জের দিকে রওনা হই। সকাল নয়টায় একটা ট্রেন ভৈরব হয়ে ঢাকায় যায়।

তিনি আমাকে শ্যামগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে যেতে পারতেন। তা করলেন না, আমার সঙ্গে রওনা হলেন। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যতটা যত্ন করে ততটাই করলেন। ট্রেনের কামরা ফাঁকা ছিল। তিনি আমাকে বেঞ্চে পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমাতে বললেন। আমি তা-ই করলাম। পথে কোনো মিলিটারি চেকিং হলো না। কিংবা হয়তো হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে জানি না।

ঢাকায় পৌঁছলাম বিকেলে। তখন ভারি বর্ষণ হচ্ছে। রাস্তায় হাঁটুপানি। রিকশায় ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমার স্বামী বললেন, আমার কিন্তু ফিরে যাওয়ার ভাড়া নাই।

আমি জবাব দিলাম না।

আমাদের বাড়ির গেট খোলা। বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর দাদাজান ভীতমুখে দরজা খুললেন। তিনি দাড়ি রেখেছেন। মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গলে তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। আমাকে দেখে তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। টেনে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার মনে পড়ল না একজন মানুষ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তার ফিরে যাওয়ার ভাড়া নেই।

দাদাজান স্তব্ধ হয়ে হুজরাখানার সব গল্প শুনলেন। ক্যাপ্টেন সামস-এর আগমন, আমার বিবাহ কিছুই বাদ গেল না।

দাদাজান বললেন (মেঝের দিকে তাকিয়ে, আমার চোখে চোখ না রেখে) বিয়ের পর বদটার সঙ্গে শারীরিক কিছু কি হয়েছে?

আমি বললাম, না।

দাদাজান হাঁপ ছেড়ে বললেন, তাহলে বিবাহ বৈধ হয় নাই। জাহাঙ্গীর হারামজাদাটাকে আমি লাথি দিয়ে বিদায় করছি।

দাদাজান হয়তো হাফেজ জাহাঙ্গীরকে লাথি দিয়ে বিদায় করতেই ঘর থেকে বের হলেন। ফিরলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি এতক্ষণ ঝুম বৃষ্টিতে ভিজছিলেন। দাদাজান বললেন, তুমি আমার নাতনিকে কষ্ট করে পৌঁছে দিয়েছ এইজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। শুকনা কাপড়

দিচ্ছি। কাপড় পরো। খাবার দিচ্ছি, খাবার খেয়ে বিদায় হয়ে যাও। আমার নাতনি তোমাকে তালাক দিয়েছে, কাজেই এখন আর তুমি তার স্বামী না।

জাহাঙ্গীর হালকা গলায় বললেন, সে আমাকে তালাক দিতে পারবে না।

কেন পারবে না?

তাকে বিয়ের সময় সেই অধিকার দেওয়া হয় নাই।

দাদাজান বললেন, তাহলে তুমি তালাক দিবে। আমি কাজী ডেকে আনছি। তুমি কাজীর সামনে তালাক দিয়ে বিদায় হবে। বুঝেছ?

জি।

জাহাঙ্গীর ভেজা কাপড় বদলালেন না। খাবারও খেলেন না। কঠিন চোখমুখ করে সোফায় বসে রইলেন।

দাদাজান বললেন, হারামজাদা! তুই আমাকে চিনিস না। আমি তোর চামড়া খুলে ফেলব।

জাহাঙ্গীর বললেন, গালাগালি কেন করছেন? যা করা হয়েছে আপনার নাতনির মঙ্গলের জন্যে করা হয়েছে।

দাদাজান বললেন, আবার ফরফর করে কথা বলে। আমি কাঁচি দিয়ে তোর জিভ কেটে ফেলব। দাঁড়া কাঁচি নিয়ে আসি।

দাদাজান হঠাৎ কেন রেগে অস্থির হলেন বুঝলাম না। তিনি সত্যি সত্যি বিশাল এক কাঁচি নিয়ে ফিরলেন। তার আগেই জাহাঙ্গীর সোফায় এলিয়ে পড়লেন। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছিল।

এই মানুষটি গুনে গুনে তিন সপ্তাহ প্রবল জ্বরে ভুগল। তাঁকে রাখা হলো একতলার একটা ঘরে।

বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো আমি আমার স্বামীর সেবা-যত্ন করলাম তা যেন কেউ মনে না করেন। মাঝে মাঝে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছি। এই পর্যন্তই।

তার নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার জবাব দিয়ে দেওয়ার পর দাদাজান তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। কঠিন গলায় বললেন, হাসপাতালে গিয়ে মরুক, আমার এখানে না।

ন্যাশনাল হাসপাতালের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হলো। তারা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রোগী নিতে এল।

রোগী সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলল, আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার রোগ সেরে গেছে। আমার বাপজানের মৃত্যু হয়েছে। আমি এখন গদিনসীন পীর।

দাদাজান বললেন, তোমাকে কে বলেছে? জ্বিনের বাদশা এসে বলে গেছে?

তিনি এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহপাক যখন কাউকে বিপদ দেন তখন পরপর তিনবার দেন। তোমার জীবনে আরও দুইবার মহাবিপদ আসবে।

তখন একমনে দোয়া গাঞ্জল আরশ পাঠ করবে। আরেকটা কথা, কুকুর থেকে সাবধান। একটা পাগলা কুকুর তোমাকে কামড়াবে।

দাদাজান বললেন, চুপ থাক বুরবাক! ফকির সাব চলে এসেছেন। পেটে পাড়া দিলে নাক-মুখ দিয়ে ফকিরি বের হয়ে যাবে।

হাফেজ জাহাঙ্গীর দাদাজানের কথা শুনে মনে হয় মজা পেয়েছেন। তাঁর মুখভর্তি হাসি।

দাদাজান বললেন, তুই হাসছিস কেন?

আপনার অকারণ রাগ দেখে হাসছি। আপনি চাইলে আপনাকে একটা তাবিজ দেব। তাবিজ ধারণ করলে রাগ কমবে।

আর একটা কথাও না। কথা বললেই থাপ্পড় খাবি।

ন্যাশনাল হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে তাঁকে রেলস্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমরা তাঁর ভাড়া দিতে ভুলে গেলাম। তিনিও চাইলেন না।

৪. মার্চ মাস

মার্চ মাস।

সে বছর মার্চ মাসে অস্বাভাবিক গরম পড়েছিল। আকাশ থেকে রোদের বদলে আগুন ঝরছে। গাছের কোনো পাতাই নড়ছে না। আসন্ন দুর্যোগে ঝিঁঝিঁপোকা দিনেরবেলা ডাকে। এখন তা-ই ডাকছে।

প্রচণ্ড গরমে কালো পোশাক পরা আর্টিলারির প্রধান মেজর ফারুক খুব ঘামছেন। গায়ের কালো শার্ট ভিজে উঠেছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ মেঘে ঢাকা। গত কয়েকদিন ধরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। মেঘের কারণেই গরম বাড়ছে। গ্রীন হাউস ইফেক্ট! একসময় নাকি পৃথিবীর গরম বাড়তে বাড়তে এমন হবে যে, মানুষ ও পশুপাখির বাসের অযোগ্য হবে। ফারুকের মনে হচ্ছে সেই দিন বেশিদূর না।

মেজর ফারুক দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর জঙ্গলে। তাঁর শীতকালীন রেঞ্জ ফায়ারিংয়ের শিডিউল। মার্চ মাসে শীত নেই। চামড়া পোড়ানো গরম পড়েছে। সকালবেলা মাঝারি পাল্লার কামানে কয়েক দফা গুলি চালানো হয়েছে। জোয়ানরা তার মতোই ক্লান্ত। তিনি সুবেদার মেজর ইশতিয়াককে ডেকে বললেন, আজকের মতো ফায়ারিং বন্ধ।

ইশতিয়াক বলল, স্যারের কি শরীর খারাপ করেছে?

ফারুক বললেন, আই অ্যাম ফাইন। গেট মি এ গ্লাস অব ওয়াটার।

তার জন্যে তৎক্ষণাৎ পানি আনা হলো। পানির গ্লাসে বরফের কুঁচি ভাসছে। ফারুক গ্লাস হাতে নিয়েও ফেরত পাঠালেন।

ইশতিয়াক বলল, স্যার, পানি খাবেন না?

ফারুক বললেন, না। একজন সৈনিক সর্ব অবস্থার জন্যে তৈরি থাকবে। সামান্য গরমে কাতর হয়ে বরফ দেওয়া পানি খাবে না।

বরফ ছাড়া পানি দেই?

না। মুক্তিযুদ্ধের সময় একনাগাড়ে দুদিন পানি না-খেয়ে ছিলাম।

ইশতিয়াক বলল, পানি ছাড়া কেন ছিলেন স্যার? বাংলাদেশে তো পানির অভাব নেই।

যেখানে ছিলাম সেখানে সুপেয় পানির অভাব ছিল। সবই পাট পচা নোংরা পানি। ভাগ্যিস পানি খাই নি। যারা খেয়েছিল তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেবার আমাদের হাতে অল্পবয়সী একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ধরা পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বোতলভর্তি পানি। দাঁড়াও, তার নামটা মনে করি। এস দিয়ে নাম। ইদানীং কেন যেন পুরনো দিনের কারোর নামই মনে পড়ে না। যাক, মনে পড়েছে। সামস। রাজপুত্রের মতো চেহারা। মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডে খুঁত থাকলেও তার কোনো খুঁত ছিল না। খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, মাথার চুল কোঁকড়ানো, আবু লাহাবের মতো গায়ের রঙ।

স্যার, আবু লাহাব কে?

আমাদের প্রফেটের চাচা। ওই সূরা নিশ্চয়ই পড়েছ—আবু লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

পড়েছি স্যার। সূরা লাহাব।

লাহাব শব্দের অর্থ আগুন। 'আবু লাহাব'-এর অর্থ আগুনের পিতা। লাহাবের গাত্রবর্ণ ছিল আগুনের মতো। ক্যাপ্টেন সামসের গায়ের বর্ণও তা-ই। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে তার একটা ছবি তুলে রাখতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে যে জিনিসটার অভাব অনুভব করেছি তা হলো একটা ভালো ক্যামেরা। ছবি তোলার মতো অপূর্ব সব সাবজেক্ট পেয়েছি। সমস্যা হচ্ছে, সৈনিকের হাতে রাইফেল মানায়। ক্যামেরা মানায় না। এখন অবশ্যি আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে। লাইকা নাম। জার্মানির ক্যামেরা। কিন্তু ছবি তোলার সাবজেক্ট পাচ্ছি না।

সুবেদার মেজর ইশতিয়াক বিনীত গলায় বলল, স্যার, এক গ্লাস পানি খান। বরফ ছাড়া এক গ্লাস পানি দিতে বলি?

না। ক্যাপ্টেন সামসের গল্পটা শোনো। আমি তার পানির বোতলের সবটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম। তাকে বললাম, থ্যাংক যু। ইউ সেভড মাই লাইফ। পানির বদলে তুমি কিছু চাও?

সে বলল, Yes! I also want to save my life.

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে হত্যা করা হবে।

সে কিছুক্ষণ শিশুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। শিশুর দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে, তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে বলল।

সে বলল, আমার হাতে কতক্ষণ সময় আছে?

আমি বললাম, আধ ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম।

সে বলল, এক কাপ কফির সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে চাই।

চা-কফি নেই। তোমাকে সিগারেট দিতে পারব।

আমি কে-টু সিগারেটের প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তাকে বললাম, মৃত্যুর জন্যে তৈরি হওয়ামাত্র আমাকে বলবে।

সামস বলল, একজন সৈনিক সবসময় মৃত্যুর জন্যে তৈরি।

পাকিস্তানি ওই ক্যাপ্টেনের কথা আমার মনে ধরেছিল। এখনো সুযোগ পেলেই আমি বলি, একজন খাঁটি সৈনিক সবসময় মৃত্যুর জন্যে তৈরি। একজন আঁটি সৈনিক যুদ্ধ ছাড়াও সারা জীবন রণক্ষেত্রে কাটায়।

পাকিস্তানি ওই ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর জন্যে কি আপনার কোনো অনুশোচনা আছে?

ফারুক বললেন, অনুশোচনা নেই। তাকে আমি নিজের হাতে গুলি করি। ওই ক্যাপ্টেন আমাদের অনেক মেয়েকে রেপ করেছে। তার অভ্যাস ছিল রেপ করার পর পর সে কামড়ে মেয়েদের স্তনের বোটা ছিঁড়ে নিত। এটা ছিল তার ফান পার্ট।

ইশতিয়াক বলল, কী বলেন স্যার!

যুদ্ধ ভয়াবহ জিনিস ইশতিয়াক। যুদ্ধে ফান পার্ট লাগে। যাই হোক, এখন এক গ্লাস পানি খাব। বরফ দিয়েই খাব। একটা জিপ রেডি করতে বলল। আমি হালিশহর যাব। একজনের সঙ্গে দেখা করব। তবে রাতেই ফিরব।

স্যার, আমি কি সঙ্গে যাব?

যেতে পারো।

হালিশহরে কার কাছে যাবেন?

একজন পীর সাহেবের কাছে যাব। তিনি জন্মান্ধ। বিহারি। কোরানে হাফেজ বলে অনেকেই তাকে 'আন্ধা হাফেজ'ও ডাকে। তুমি কি তার বিষয়ে কিছু জানো?

জি-না স্যার।

আমার জানামতে তিনি একমাত্র মানুষ যিনি ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখেন। আল্লাহপাক অল্প কিছু মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। তিনি তাঁদের একজন।

বলেন কী স্যার!

আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি। ভালো কথা, আমিও যে পীরবংশের সন্তান তা কি জানো?

জি-না স্যার।

আমি পীরবংশের। বংশের ধারা অনুযায়ী আমি এখন গদিনশীন পীর। অথচ আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। এটা একটা আফসোস। তবে আফসোস থাকা ভালো। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে পুরোপুরি সফল জীবন পার করার পরেও আফসোস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ইশতিয়াক বলল, স্যার, আপনি মাঝে মাঝে ফিলোসফারদের মতো কথা বলেন।

মেজর ফারুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সরি ফর দ্যাট! একজন সৈনিক সবসময় সৈনিকের মতো কথা বলবে। ফিলোসফারদের মতো বা রাজনীতিবিদদের মতো কথা বলবে না।Thate both the classes.

ইশতিয়াক বলল, স্যার, একটা কথা বলি?

ফারুক বললেন, বলো।

আপনি প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চমৎকার সব গল্প করেন, কিন্তু আপনি মুক্তিযুদ্ধে খুব অল্প সময় ছিলেন। আপনি যুদ্ধে গেলেন নভেম্বরের শেষ দিকে। দেশ স্বাধীন হলো ডিসেম্বরে।

ফারুক বললেন, তুমি কি আমার গল্প অবিশ্বাস করছ?

জি-না স্যার।

একটি যুদ্ধে চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। পারে না?

পারে স্যার।

ক্যাপ্টেন শামস নিয়ে আমি প্রায়ই যে গল্পটি করি তা অনরেকর্ড আছে। জেনারেল ওসমানির যুদ্ধকালীন আর্কাইভ। Do you understand?

Yes sir.

অতিরিক্ত চালাক হয়ো না। সেনাবাহিনী অতিরিক্ত চালাকদের জন্যে নয়।

স্যরি স্যার।

টিনের বেড়া, টিনের চালা। ছোট্ট কামরা। দড়ির চারপাইয়ের এক কোনায় প্রচণ্ড গরমেও উলের চাদর গায়ে আন্ধা পীর বসে আছেন। চারপাইয়ের এক কোনায় বিশাল হারিকেন। হারিকেনের কাচ ঠিকমতো লাগানো হয় নি বলে বুনকা বুনকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাতাসের কারণে ধোয়া যাচ্ছে আন্ধা পীরের নাকেমুখে। তাতে তাঁকে ব্রিত মনে হচ্ছে না। চাদরের

বাইরে তার ডানহাত বের হয়ে আছে। হাতে মোটা দানার তসবি। দানাগুলির একেকটির রঙ একেক রকম।

মেজর ফারুকের হঠাৎ মনে হলো, এ রকম একটি তসবি ফরিদা পেলে খুশি হতো। মালা বানিয়ে গলায় পরত। এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসায় ফারুক খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। ফারুক বললেন, পীর সাহেব। আসসালামু আলায়কুম।

আন্ধা হাফেজ সালামের জবাবে মাথা নাড়লেন। মুখে সালামের উত্তর দিলেন।

আন্ধা হাফেজ পরিষ্কার শুদ্ধ উর্দুতে বললেন (বিহারিরা শুদ্ধ উর্দু জানে না), আপনি সৈনিক মানুষ। আপনি কষ্ট করে আমার কাছে এসেছেন। আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন।

হুজুর! আমি সৈনিক মানুষ, তা কী করে টের পেলেন?

আন্ধা হাফেজ হাসতে হাসতে বললেন, আমি কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় এই সংবাদ পাই নি। আপনি বুট পায়ে দিয়ে এসেছেন, বুটের শব্দে টের পেয়েছি। বুট জোড়া খুলে আমার পাশে বসুন।

ফারুক তা-ই করলেন। আন্ধা পীর বললেন, সৈনিকদের সম্পর্কে একটি রসিকতা শুনবেন?

শুনব।

বলা হয়ে থাকে, সৈনিকদের বুদ্ধি থাকে হাঁটুতে। এটা ঠিক না। তাদের বুদ্ধি থাকে বুটজুতায়। যখন তারা বুট পরে, তখন তারা বুদ্ধিশূন্য মানুষে পরিণত হয়। তখন তাদের বুদ্ধি চলে যায় বুটজুতায়। এই কারণে কোনো সৈনিক যখন আমার কাছে আসে, আমি তাকে বুট খুলে আমার কাছে বসতে বলি। এখন বলুন, আমার কাছে কেন এসেছেন?

ফারুক বললেন, আমি একটা কাজ করার পরিকল্পনা করেছি। আপনার দোয়া নিতে এসেছি।

আন্ধা পীর বললেন, আপনার ডানহাতটা আমার দিকে বাড়ান। আমি ধরে দেখি।

ফারুক হাত বাড়ালেন। আন্ধা পীর দুই হাতে ফারুকের হাত ধরলেন।

সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের কাছে দেওয়া বর্ণনায় মেজর ফারুক হাত ধরাধরির এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হঠাৎ তার মনে হলো শরীর দিয়ে যেন হাইভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেছে।

মেজর ফারুকের বর্ণনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সাধক অনুকূল ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের মিল আছে। শীর্ষেন্দু লিখেছেন, ঠাকুর আমার গায়ে হাত রাখামাত্র আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো আমার শরীর অবশ হয়ে গেল।

আন্ধা হাফেজ ফারুকের হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনার পরিকল্পনা অতি বিপজ্জনক এবং অতি ভয়ঙ্কর। কাজটি যদি আপনি নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না করেন তাহলে সফলকাম হবেন এবং বিপদেও পড়বেন না। তবে সময় এখনো আসে নি। যে-কোনো কাজের জন্যে নির্ধারিত সময় আছে।

ফারুক বললেন, নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আপনি কি আমাকে জানাবেন?

জানাব।

ফারুক বললেন, যদি ইজাজত দেন তাহলে আমি উঠব।

আন্ধা হাফেজ মাথা নাড়লেন এবং ফারুকের দিকে হাতের তসবি এগিয়ে দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করুন। এই উপহার আপনার কোনো কাজে আসবে না, তা জানি। তবে আপনার প্রিয় কাউকে উপহার দিতে পারেন। একই জিনিসের নানান ব্যবহার হয়ে থাকে। যে লাঠি দিয়ে অন্ধ মানুষ পথ চলে, সেই লাঠি দিয়ে মানুষও খুন করা যায়। হাতের তসবি গলার মালাও হতে পারে।

আন্ধা হাফেজের কথার মাঝখানেই চারপাইয়ের নিচ থেকে দুটি বিড়াল লাফ দিয়ে হাফেজের দু’পাশে বসল। ফারুকের মনে হলো বিড়াল দুটিও অন্ধ।

জিপ শহরের দিকে ছুটে চলেছে। ফারুক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আকাশে ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাসও ছেড়েছে, মনে হয় দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি কি দূরেই হতে থাকবে? নাকি এগিয়ে আসবে?

বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়ে জিপ থেমে গেল। ফারুক বললেন, সমস্যা কী?

ড্রাইভার বলল, চাকা পাংচার হয়েছে স্যার। স্পেয়ার আছে। দশ মিনিট লাগবে।

ফারুক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, Take your time.

ইশতিয়াক বলল, স্যার কি জিপ থেকে নামবেন?

ফারুক জবাব দিলেন না। সিগারেটে টান দেওয়ামাত্র তাঁর মাথায় আবারও পুরোনো পরিকল্পনা চলে এসেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করে দেশে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো।

পরিকল্পনা এখন ঈগল পাখি। পাখির দুটি ডানার একটি ডানা হলো সামরিক। হত্যা কীভাবে করা হবে? কারা করবে? দ্বিতীয় ডানা হচ্ছে রাজনৈতিক। এত বড় ঘটনা রাজনৈতিকভাবে কীভাবে সামাল দেওয়া হবে? এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর ভায়রা ভাই মেজর রশীদকে। সে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। তার ওপর ভরসা করা যায়।

কাগজে-কলমে করা নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবে ভেস্তে যায়। তুচ্ছ কারণেই ঘটে। A kingdom is lost for a nail.

পরিকল্পনা কী কী কারণে জলে ভেসে যেতে পারে ফারুক তা ভাবার চেষ্টা করছেন।

১. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই প্রকাশ পেয়ে যাবে। পরিকল্পনাকারীরা ধরা খাবে। তাদের কোর্টমার্শাল হবে। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন সামস যেভাবে হতভম্ব চোখে পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকেও সেইভাবেই কোনো এক পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

২. মূল পরিকল্পনা অতি অল্পকিছু মানুষকে জানানো হবে, যাদের দিয়ে কার্যসমাধা করতে হবে। তারা বেঁকে বসতে পারে। তারা বলতে পারে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রশ্নই ওঠে না।

৩. ফারুকের হাতে ট্যাঙ্কবহর আছে। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ত্রিশটি টি-৫৪ ট্যাঙ্ক এবং চার শ' রাউন্ড ট্যাঙ্কের গোলা বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। গোলা এখন গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তালাবন্ধ।
ফারুক ট্যাঙ্কবাহিনীর প্রধান, কিন্তু তার ট্যাঙ্ক গোলাশূন্য। এমনকি মেশিনগানের গুলি পর্যন্ত নেই। এই ট্যাঙ্ক আর খেলনা ট্যাঙ্ক তো একই।

জিপ চলতে শুরু করেছে। জিপের চাকা কখন বদল হয়েছে, কখন জিপ চলতে শুরু করেছে, ফারুক কিছুই জানেন না। তিনি এতক্ষণ ছিলেন ঘোরের মধ্যে। হঠাৎ ঘোর কেটেছে।

ফারুক আনন্দে অভিভূত হলেন। কারণ, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঝুম বৃষ্টি। তার ইচ্ছা করছে জিপ থামিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় নেমে বৃষ্টিতে ভিজেন। তিনি বৃষ্টিবিষয়ক একটি বিখ্যাত কবিতা মনে করার চেষ্টা করছেন। কিছুতেই মনে পড়ছে। শুধু একটা লাইন মনে আসছে-বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

খন্দকার মোশতাকের আগামসি লেনের বাড়ির দোতলায় মেজর রশীদ বসে আছেন। তাঁর গায়ে সামরিক পোশাক না। তিনি আজ নকশিদার পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথায় কিস্তি টুপি পরেছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে কিছুক্ষণ আগে তিনি একবার নামাজ শেষ করে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন।

মেজর রশীদ বললেন, দেশের মহাবিপদ যদি কখনো হয় আমরা কি আপনাকে পাব?

খন্দকার মোশতাক জবাব দিলেন না। ফরসি হুক্কা টানতে লাগলেন। অতিরিক্ত গরমের কারণে খন্দকার মোশতাকের গায়ে পাতলা স্যান্ডোগেঞ্জি। মাথায় নেহেরু টুপি। তাঁর আশা ছিল এই টুপি দেশে জনপ্রিয় হবে। তা হয় নি। মুজিবকোট জনপ্রিয় হয়েছে। কালো রঙের এই কোট পরলে নিজেকে পেঙ্গুইন পাখির মতো লাগে। তারপরেও কপালের ফেরে পরতে হয়।

মেজর রশীদ বললেন, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি জবাব দেন নি। প্রশ্নের জবাব জানা বিশেষ প্রয়োজন। প্রশ্নটা আবার করছি। দেশের পরম সংকটে আমরা কি আপনাকে পাব?

খন্দকার মোশতাক বললেন, আমরা মানে কারা?

সেনাবাহিনী।

খন্দকার মোশতাক মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, গরম কী পড়েছে দেখেছেন? ফ্যানের বাতাসে লু হাওয়া।

রশীদ বললেন, লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য কী?

খন্দকার মোশতাক বললেন, খানা খান। খানা দিতে বলি।

খানা খাব না। আমি আপনার কাছে খানা খেতে আসি নি। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্যে এসেছি।

মোশতাক বললেন, বাড়িতে আজ মোরগপোলাও হয়েছে। খেয়ে দেখেন, মুখে অনেক দিন স্বাদ লেগে থাকবে। তা ছাড়া আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছেন। খেতে খেতে বলুন। আমি এখন হা-না কিছু বলব না। আমি শুধু শুনে যাব।

মেজর রশীদ বললেন, আপনার সম্পর্কে একটি বিশেষ গল্প প্রচলিত। গল্পটির সত্য-মিথ্যা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

খন্দকার মোশতাক শীতল গলায় বললেন, কী গল্প?

একবার নাকি আপনি, পরিকল্পনা পরিষদ প্রধান ড. নুরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু নাশতা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, গত রাতে আমি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি।

আপনি জানতে চাইলেন, কী স্বপ্ন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহপাক আমাকে কোরবানির নির্দেশ দিলেন। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন আমি কোরবানি দিতে প্রস্তুত। কোরবানি দিতে হয় সবচেয়ে প্রিয়জনকে। এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন হলো খন্দকার মোশতাক। ভাবছি তাকেই কোরবানি দিব।

মেজর রশীদ কথা শেষ করে তাকিয়ে রইলেন। খন্দকার মোশতাক বললেন, শেখ মুজিবের কোনো রসবোধ নেই। ভুল সময়ে ভুল রসিকতা করে তিনি আনন্দ পান। আর আমরা পেঙ্গুইনরা তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকি। এটা আমাদের নিয়তি।

মেজর রশীদ বললেন, গল্পটায় কি সত্যতা আছে?

না।(১)

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ত্রি বত্রিশ নম্বর বাড়িতে এসেছেন RAW (ভারতের সিক্রেট সার্ভিস)-এর রিসার্চ ও অ্যানালাইসিস উইংয়ের পরিচালক কাও। তিনি এসেছেন পানবিক্রেতার ছদ্মবেশে।(২)

শেখ মুজিবুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, আমি আপনাকে চিনি। অনেকেই আপনাকে চেনে। আপনার ছদ্মবেশ ধরার প্রয়োজন পড়ল কেন?

কাও বললেন, মাঝে মাঝে নিজেকে অন্যরকম ভাবতে ভালো লাগে বলেই ছদ্মবেশ। আপনাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মেজর রশীদ, ফারুক, লে. কর্নেল ওসমানী এই নিয়ে আলোচনায় বসেন জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায়। এই বিষয়ে আপনাকে তথ্য দিতে এসেছি।

শেখ মুজিব বললেন, আপনারা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। পানবিক্রেতার ছদ্মবেশে যে আমার কাছে তথ্য দিতে আসে তার কথায় আমার বিশ্বাস নেই।

আপনার সামনে মহাবিপদ।

মহাবিপদ আমি পার করেছি। পাকিস্তানের কারাগারে যখন ছিলাম তখন বিপদ আমার ঘাড়ে বসে ছিল। এখন বিপদ ঘাড় থেকে নেমেছে।

ঘাড় থেকে নামে নি স্যার।

শেখ মুজিব বললেন, যাদের কথা আপনি বলছেন তারা আমার সন্তানসম। আমি এই আলোচনা আর চালাব না। আমার শরীরটা ভালো না। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি ঘুমুতে যাব।

স্যার, আপনি ভুল করছেন।

ভুল আমি করছি না। আপনারা করছেন।

আমার কথা আপনি আমলে নিচ্ছেন না—ভালো কথা। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার কথা কি আমলে নেবেন?

শেখ মুজিব উঠে দাঁড়ালেন। পানবিক্রেতার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাওয়া তার কাছে অর্থহীন মনে হলো।

——-

সূত্র-১: গল্পটির সত্যতা আছে। বাংলা একাডেমী পত্রিকা উত্তরাধিকার, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪১৭ দ্রষ্টব্য।

সূত্র-২: Inside RAW, the Story of India Secret Service. Asoka Raina. Vikas Publication, New Delhi, India.
RAW agents received information of a meeting between Major Rashid, Major Farooq and Lt Col Usmani at Zia-ur-Rahman's residence. The decision, among other things, had centred on the coup. During the three-hour meeting one of the participants had doodled on a scrap of paper, which had been carelessly thrown into the waste basket. The scrap had been collected from the rubbish pile by a clerk and passed on to the RAW operative. The information finally reached New Delhi.

Kao, convinced that a coup was in the offing, flew into Dacca, under cover of a pan exporter. After his arrival at Dacca, he was driven to a rendezvous arranged beforehand. Mujib is reported to have found the exercise highly dramatic and just could not understand why kao could not have come to see him officially.

The Kao-Mujib meeting lasted one hour. Kao was unable to convince Mujib that a coup was brewing and that his life was threatened, in spite of being given the names of those suspected to have been involved.

৫. সরফরাজ খান

সরফরাজ খান দোতলায় জানালার পাশে বসে আছেন। জানালার কাঠের খড়খড়ি খানিকটা নামানো। তিনি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাড়ির বাইরের উঠান খানিকটা দেখতে পাচ্ছেন। সরফরাজ খানের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের মধ্যে একটি হলো জানালার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা। এই তাকিয়ে থাকা অর্থহীন। তাঁর বাড়িতে কেউ ঢোকে না, কেউ বেরও হয় না। বাড়ির দারোয়ান কালাম মাঝে মধ্যে পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। বিলাপের সুরে শব্দ করে। মনে হয় গান করে। কালামের গান শোনার আগ্রহে সরফরাজ খান অপেক্ষা করেন—এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

সকাল এগারটা। গত রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া ঠান্ডা। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের মতো হয়েছিল। প্রচুর পাতা পড়েছে। পাতা পরিষ্কার করা হয় নি। পাতার ওপর পা ছড়িয়ে কালাম বসে আছে। সাইকেলের ঘণ্টার ক্রিং ক্রিং শব্দ হলো। সরফরাজ জানালার খড়খড়ি আরও খানিকটা তুললেন। সাইকেল আরোহীকে যদি দেখা যায়।

আরোহীকে দেখা গেল। সরফরাজ ভেবেছিলেন পোস্টঅফিসের পিয়ন। পোস্টঅফিসের পিয়নরা লাল রঙের সাইকেলে করে চিঠি বিলি করে। তা না। মায়া মায়া চেহারার শ্যামলা একটি মেয়ে সাইকেলে চড়ে এসেছে। মেয়েটি ছেলেদের মতো শার্ট-প্যান্ট পরেছে। শার্ট-প্যান্ট দু'টার রঙই কালো। এই মেয়ে কে?

কালাম হাসিমুখে এই মেয়েকে সালাম দিল। সদর দরজা খুলে দিল। মেয়েটি কালামের হাতে সাইকেল ধরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এর একটাই অর্থ, মেয়েটি কালামের পূর্বপরিচিত।

সরফরাজ খানের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। তিনি প্রায় সারা দিন বাড়িতে থাকেন, তারপরেও এ বাড়িতে কিছু লোকজন আসে যাদের বিষয়ে তিনি জানেন না। নিশ্চয়ই এই মেয়ে অবন্তির কাছে এসেছে। অবন্তি তাকে কিছু জানায় নি। অবন্তির অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে অনেক কিছুই গোপন করে। মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে গোপন করা। বয়ঃসন্ধিকালে তারা শরীর গোপন করতে শেখে। গোপন করার এই অভ্যাস তাদের মাথায় ঢুকে যায়। তখন তারা সবই গোপন করে।

কালাম হারামজাদা কেন গোপন করেছে? পাছায় লাথি দিয়ে বদটাকে বিদায় করা দরকার। বদটা এখন ক্রি ক্রিং শব্দে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছে। যেন হাতে খেলনা পেয়েছে। সরফরাজ জানালার পাট খানিকটা খুলে ডাকলেন, কালাম!

কালাম ওপরের দিকে তাকাল। সরফরাজ বললেন, ওপরে আসো। বলেই জানালা বন্ধ করলেন। তবে তিনি এখনো খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কালাম বদটাকে দেখতে পাচ্ছেন। বদটা যে ভয় পেয়েছে তা না। এখনো সাইকেলের ঘণ্টি বাজাচ্ছে। সরফরাজ খান মনে মনে বললেন, তোমার সুখের দিন আজই শেষ। পত্রপাঠে বিদায়।

দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় সরফরাজের ঘর অন্ধকার। কিছুদিন হলো তাকে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে, কারণ তার চোখ উঠেছে। আলোর দিকে তাকালেই চোখ কড়কড় করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের সব মানুষের চোখে এই রোগ হয়েছিল। তখন রোগের নামকরণ হয়েছিল জয়বাংলা রোগ'। সরফরাজ খানের তখন এই রোগ হয় নি, এখন হয়েছে। মানসিক টেনশনের সঙ্গে কি এই রোগের কোনো যোগ আছে?

প্রবল মানসিক চাপের কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় সবার এই রোগ হয়ে গেল। তিনি কোনো মানসিক চাপে ছিলেন না বলে তার হয় নি। এখন মানসিক চাপে আছেন বলে চোখে জয়বাংলা রোগ হয়েছে। মানসিক চাপটা অবন্তিকে নিয়ে।

কালাম তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতে সে কুঁজো না। বুক টান করে হাঁটে। শুধু তার সামনেই কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। সরফরাজ বললেন, সাইকেলে করে এসেছে মেয়েটা কে?

শামিমা আপু।

শামিমা আপু বললে তো আমি কিছু বুঝব না। শামিমা আপুটা কে?

অবন্তি আপুর বান্ধবী। ফ্রেন্ড!

সরফরাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কোনোদিন এই মেয়েকে দেখলাম না। অবন্তির কাছে তার নাম শুনলাম না। সে হয়ে গেল অবন্তির বান্ধবী?

শামিমা আপু পেরায়ই আসেন।

প্রায়ই যদি আসে আমার সঙ্গে দেখা হয় না কেন?

আপনি দুপুরে খানার পরে যখন ঘুম যান, তখন শামিমা আপু আসে।

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন, তুমি ওই মেয়ের কাছে যাও। তাকে আসতে বলো।

কালাম বলল, এখন যাওয়া যাবে না।

এখন যাওয়া যাবে না কেন?

উনারা দুইজন দরজা বন্ধ কইরা কী জানি করেন।

সরফরাজ খানের মাথায় চক্কর দিল। দরজা বন্ধ করে কী জানি করে, এর মানে কী? খুব খারাপ কিছু না তো? কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!

সরফরাজ খান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যাও, বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন দরজা খুলবে তখন তাকে নিয়ে আসবে।

জি আচ্ছা।

দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। ওরা কী কথা বলে তা আমার জানা দরকার।

জি আচ্ছা স্যার।

সরফরাজ তিক্ত গলায় বললেন, দরজা বন্ধ করে গল্প করার কী আছে তাও তো বুঝলাম না।

কালাম বলল, শামীমা আপু ছিগরেট গাঁজা এইগুলা খায় তো, এইজন্যে দরজা বন্ধ রাখে।

সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন, কী বলো!

কালাম বলল, কথা সত্য স্যার। আমি দুইবার উনারে ছিগরেট আইনা দিছি। উনি খায় কেটু ছিগারেট। কড়া আছে। পাকবাহিনী এই ছিগারেট খাইত।

সরফরাজ নিজেই একতলায় নেমে এলেন, অস্বস্তি নিয়ে বন্ধ দরজার পাশে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেতর থেকে কোনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না, তবে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার ইচ্ছা করছে লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে শামীমা মেয়েটিকে বের করেন। এই কাজটা করলে অবন্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরতরে নষ্ট হবে বলে কাজটা করতে পারছেন না।

ছেলেদের মতো পোশাক পরা মেয়েটির নাম শামীমা না। তার নামও ছেলেদের মতো। শামীম। পুরো নাম শামীম শিকদার। সে মাওবাদী সিরাজ সিকদারের ছোটবোন। পেশায় ভাস্কর। কিছুদিন আগে ভাস্কর্যে সে প্রেসিডেন্ট পদক পেয়েছে।

শামীম সিকদারের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের লেকচারার হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্ঠতা আছে। শামীম শিকদার হুমায়ূন আহমেদের প্রথম গ্রন্থ নন্দিত নরকের প্রচ্ছদ শিল্পী। বইয়ের দুটি মুদ্রণে শামীম শিকদারের প্রচ্ছদ ছাপা হয়। তারপর প্রচ্ছদ করেন কাইয়ুম চৌধুরী। শামীম শিকদারকে প্রায়ই দেখা যেত সাইকেল চালিয়ে (মাঝে মাঝে মোটর সাইকেল) হুমায়ূন আহমেদের বাবর রোডের বাসায় (শহীদ পরিবার হিসেবে সরকার থেকে পাওয়া) উপস্থিত হতো। সে সারাক্ষণ হুমায়ূন আহমেদের মায়ের সঙ্গে থাকত। গলা নিচু করে গুটুর গুটুর গল্প করত।

অবন্তির সঙ্গে শামীম সিকদারের পরিচয়ের সূত্র হচ্ছে, অবন্তি আর্ট কলেজ থেকে তাকে ধরে এনেছে। শামীম শিকদারের দায়িত্ব মাটি দিয়ে অবন্তির একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা। অবন্তি এই মূর্তি পাঠাবে তার মাকে।

সরফরাজ মোটামুটি বিচারকের আসনে বসে অবন্তির বান্ধবীর অপেক্ষা করছেন। বসেছেন কাঠের চেয়ারে। সোফায় আয়েশ করা বসা না। তার হাতে দৈনিক ইত্তেফাক। গোল করে চোঙার মতো করা। চোঙা কী কাজে আসবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

অবন্তি ঘরে ঢুকে হালকা গলায় বলল, আমাকে ডেকেছ?

সরফরাজ বললেন, তোকে তো ডাকি নি। তোর বান্ধবী কোথায়?

চলে গেছে।

চলে গেছে মানে কী? তাকে বলা হয়েছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

অবন্তি বলল, সে তোমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে নি। চোখমুখ শক্ত করে বসে থাকবে না। কী জানতে চাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি বলে দেব।

ওই মেয়ে নাকি গাঁজা খায়?

হুঁ, খায়।

গাঁজা খাওয়া ক্যাটাগরির একটি মেয়ের সঙ্গে তোর পরিচয় কীভাবে?

অবন্তি বলল, তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। এই মেয়ে গাঁজা খাচ্ছে তাতে কী হচ্ছে? আমি তো তার কাছ থেকে গাঁজা খাওয়ার ট্রেনিং নিচ্ছি না।

সরফরাজ খান বললেন, তুই কিসের ট্রেনিং নিচ্ছিস?

অবন্তি হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি কোনো ট্রেনিং নিচ্ছি না। আমি শুধু তার সামনে এক ঘণ্টা নেংটো হয়ে বসে থাকি।

কী বললি?

অবন্তি বলল, কী বলেছি তা তুমি ভালোই শুনেছ। দ্বিতীয়বার বলব না। আমার বান্ধবী আমার আবক্ষ মূর্তি বানাচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই লেপ-তোষক গায়ে দিয়ে মূর্তির জন্যে সিটিং দেব না।

তুই ওই মেয়ের সামনে নগ্ন হয়ে বসে থাকিস?

হ্যাঁ।

আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বলিস?

বিশ্বাস করতে না চাইলে করবে না।

অবন্তি ঠোঁট গোল করে শিস বাজানোর চেষ্টা করল। এই চেষ্টার পেছনের উদ্দেশ্য একটাই—দাদাজানকে রাগানো। তবে আজ মনে হয় তিনি রাগবেন না। বিস্ময়ে হতভম্ব হওয়া মানুষ রাগতে পারে না।

অবন্তি দাদার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে কুঁ কুঁ শব্দ করতে লাগল। সরফরাজ অবাক হয়ে বললেন, এমন করছিস কেন?

অবন্তি বলল, ভেঙাচ্ছি।

But why?

তোমার ওপর রাগ লাগছে, এইজন্যে ভেঙাচ্ছি।

হতভম্ব সরফরাজ বললেন, কেন রাগ লাগছে, সেটা কি জানতে পারি?

না, জানতে পারো না। কারণ আমি নিজেই জানি না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, আমার কিসের ব্যথা যদি জানতেম তাহলে তোমায় জানাতেম।' কথাগুলি মনে হয় উলট-পালট হয়ে গেল। স্যারের কাছ থেকে জানতে হবে।

তোর স্যার সব জানে?

সব জানে না, তবে যা জানার তা জেনে দিতে পারে।

তাহলে তো বিরাট কর্মীপুরুষ।

ঠাট্টা ঠাট্টা গলায় কথা বলছ কেন দাদাজান? পুলিশের এসপি হয়ে তুমি যেমন কর্মীপুরুষ, রাস্তার মোড়ে যে প্রৌঢ়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমনে ইট ভাঙে সেও কর্মীমহিলা।

দরজায় কড়া নড়ছে। সরফরাজ নিজেই দরজা খুলতে গেলেন। এই সময় পিয়ন আসে। পিয়নের হাত থেকে চিঠি সংগ্রহ করা তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করেন। চিঠি পড়ার পর যার যার চিঠি তিনি তাকে দেন। চিঠি Edit-ও করা হয়। অপছন্দের কিছু লাইন কেটে দেওয়া হয়। সব চিঠি যে প্রাপকের কাছে দেওয়া হয় তাও না। নষ্ট করে ফেলা হয়। খাম খোলার যাবতীয় সরঞ্জাম তার কাছে আছে।

চিঠি এসেছে দুটা। একটা পাঠিয়েছেন অবন্তির মা ইসাবেলা। হঠাৎ করে চিঠি আসার অর্থ কী তিনি বুঝতে পারছেন না। এই বদ মহিলা বছরে দু'টা, খুব বেশি হলে তিনটা, চিঠি পাঠায়। সরফরাজ খান ভুরু কুঁচকে চিঠি সরিয়ে রাখলেন। সময় নিয়ে খুলতে হবে, সময় নিয়ে পড়তে হবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

দ্বিতীয় চিঠি দেখে সরফরাজ খানের ভুরু কুঁচকালো এবং তার ঘাড় ব্যথা করতে লাগল। হঠাৎ প্রেসার বেড়ে গেলে তার ঘাড় ব্যথা করে। চিঠি লিখেছে গদিনশীন পীর হাফেজ জাহাঙ্গীর। অবন্তিকে লেখা চিঠি। বদমাইশ এখনো অবন্তিকে তার স্ত্রী মনে করছে। বদমাইশটাকে জুতাপেটা করা দরকার।

সরফরাজ খান চিঠি নিয়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

চিঠি খুললেন। এই চিঠি খুলতে সাবধানতার কিছু নেই। চিঠি অবন্তির কাছে দেওয়া হবে না। ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। এতে দোষের কিছু নেই। পরিবার হলো রাষ্ট্রের মতো। রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ থাকে। তারা রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করে। পরিবারেও গোয়েন্দা বিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই গোয়েন্দা বিভাগ পরিবারের কল্যাণে কাজ করবে।

চিঠি হুবহু তুলে দেওয়া হলো—

আমার প্রাণপ্রিয় পত্নী মায়মুনা
ওরফে অবতি!

সরফরাজ মনে মনে বিড়বিড় করলেন, বদমাইশ! নামটাও জানে না। বলে অবতি। এদিকে প্রাণপ্রিয় পত্নী। তোকে যদি নেংটা করে চক্কর না দেওয়াই আমার নাম সরফরাজ খান না।

পরসমাচার এই যে, আল্লাহপাকের অসীম মেহেরবানিতে আমি ভালো আছি। সোবাহানাল্লাহ। সোবাহানাল্লাহ। সোবাহানাল্লাহ।

তোমার স্বাস্থ্যও নিশ্চয় ভালো আছে। আমি প্রতি বৃহস্পতিবার আছরের ওয়াক্তে তোমার জন্য খাস দিলে দোয়া করিতেছি।

প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে জ্বিনসহ যে দোয়া করা হয় তাহাতেও তোমার নাম উল্লেখ করি। গত বুধবার তিন ঘটিকায় তোমার পত্র পাইয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। বলিলে বিশ্বাস হইবে না, আমার দুই চোখেই পানি আসিয়াছে। গদিনসীন পীর হিসাবে আমি কী করি এবং তোমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর হুজরাখানা কেমন চলিতেছে তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। আলহামদুলিল্লাহ, সোবাহানাল্লাহ।

শ্রাবণ মাসের ৭ তারিখ বাদ-আছর হুজরাখানায় আমার পিতার মৃত্যুদিবসে ওরস উদ্যাপন হইবে। ইনশাল্লাহ।

এই উপলক্ষে তুমি চলিয়া আসো। তোমার দাদাজান মনে হয় তোমাকে পাঠাইতে রাজি হইবেন না। এমতাবস্থায় তোমাকে নেওয়ার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে পাঠাইতে পারি। কিংবা আমি নিজেও আসিতে পারি।

তোমার ভরণপোষণের টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই। ইহাতে রাগ করিও না। স্বামী হিসাবে আমার ইহা কর্তব্য।

জ্বিন কর্তৃক জানিয়াছি, সামনে তোমার বড় ফাড়া আছে। আমি তোমাকে একটা তাবিজ পাঠাইলাম। তাবিজটি পঞ্চধাতুর কবজে ভরিয়া তোমার শোবার ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিবে।

তাবিজ ঝুলাইবার পর পর ঘরে বিড়ালের উপদ্রব হইতে পারে। ভয় পাইও না এবং অবশ্যই বিড়ালগুলিকে কোনো খাবার দিবে না। তাহাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করারও প্রয়োজন নাই।

ইতি
জাহাঙ্গীর খতিবি
গদিনসীন পীর, খতিবনগর হুজরাখানা

সরফরাজ খান সঙ্গে সঙ্গে চিঠি টুকরা টুকরা করে ডাস্টবিনে ফেললেন। তারপরই চিঠির টুকরা ডাস্টবিন থেকে তুলে আলাদা করলেন। আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। একটা টুকরাও যেন অবন্তির হাতে না যায়। কোনো কাজে দেরি করতে নেই। সরফরাজ খান দিয়াশলাই জ্বালিয়ে চিঠির টুকরা পোড়ালেন। মুসলমান মাতার গর্ভে এবং মুসলমান পিতার ঔরসে জন্ম নেওয়ার কারণেই হয়তো তাবিজটা পোড়াতে পারলেন না। তাবিজটা এ রকম—

তিনি এই তাবিজ পঞ্চধাতুর কবচে ভর্তি করে গোপনে অবন্তির শোবার ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঝুলাবার ব্যবস্থাও করলেন। নানান ঝামেলায় তার সারা দিন গেল বলে অবন্তির

মা ইসাবেলার চিঠি পড়ার সুযোগ হলো না। তিনি ঠিক করলেন, এই চিঠি রাতে ঘুমুবার সময় ঠান্ডা মাথায় পড়বেন। এখন মাথা কিঞ্চিৎ গরম হয়ে আছে।

অবন্তি দাদাজানকে নিয়ে রাতের খাবার খেতে বসেছে। আজ রান্না হয়েছে পাখির মাংস। খালেদ মোশাররফ চাচু ছয়টা ঘুঘু পাখি দিয়ে গেছেন। ছয়টাই রান্না হয়েছে। সরফরাজ খান আনন্দ নিয়ে খাচ্ছেন। অবন্তি খাচ্ছে ডিমভাজা দিয়ে। সরফরাজ খান বললেন, পাখি খাচ্ছিস না?

অবন্তি বলল, আমি পাখি খাই না। বিশেষ করে ঘুঘু খাওয়া তো অসম্ভব। হেমন্তের ওই গানটা মনে করো—'ছায়া ঢাকা, ঘুঘু ডাকা গ্রামখানি ওই...'

অবন্তিকে থামিয়ে সরফরাজ বিরক্ত গলায় বললেন, মোরগ, হাঁস এইসব তো খাস?

হুঁ।

ওরা পাখি না? ওরা সুন্দর না?

না। মোরগ কু কু করে ডাকে, আর হাঁস প্যাক প্যাক করে। অসহ্য! এই দুই পাখি আবার মানুষের বিষ্টা খায়।

সরফরাজ বিরক্ত গলায় বললেন, তোর সঙ্গে আর্গুমেন্টে যাওয়া আর একটা কাতল মাছের সঙ্গে আর্গুমেন্টে যাওয়া একই। আমরা দুইজন দুই জগতের বাসিন্দা।

অবন্তি বলল, ঠিকই বলেছ। ভেরি রাইট। তুমি স্থলচর আমি জলচর। এখন বলো, জলচর প্রাণীর কাছে জনৈক স্থলচর প্রাণীর চিঠিটা কি নষ্ট করে ফেলেছ?

তার মানে?

অবন্তির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, দুপুরে আমি তোমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কাগজ পোড়ার গন্ধ পেলাম। তোমার ঘরের দরজা কখনো বন্ধ থাকে না। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করে তুমি নিষিদ্ধ কিছু কাজ করে বলে আমার ধারণা।

সরফরাজ খান বললেন, কাগজ পোড়ার গন্ধ থেকে তুই বুঝে ফেললি আমি তোর চিঠি পোড়াচ্ছি?

হ্যাঁ। কারণ আমি জলচর প্রাণী হলেও আমার বুদ্ধি স্থলচরদের চেয়েও বেশি। ভালো কথা, দাদাজান, আমি দু'দিনের জন্যে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। কোথায় যাব জিজ্ঞেস করবে না। কারণ আমি বলব না।

একা যাবি?

একা যাব না। সঙ্গে চড়নদার আছে।

চড়নদার লাগবে কেন? আমি তোকে নিয়ে যাব। তোকে আমি চড়নদারের সঙ্গে ছাড়ব না।

আমি তোমাকে নেব না। প্রয়োজনে একা যাব, কিন্তু তোমাকে নেব না।

চড়নদারটা কে? আমাদের মাস্টার?

হতে পারে। সম্ভাবনা আছে। উনি যদি আমার সঙ্গে না যান, তাহলে একাই যাব।

তোর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তোর চিকিৎসা দরকার।

অবন্তি বলল, ঠিক বলেছ। যেদিন মাথা পুরোপুরি খারাপ হবে সেদিন ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব। ঠিক কোন জায়গাটায় লাফিয়ে পড়ব তাও ঠিক করে রেখেছি। একদিন তোমাকে দেখাব।

সরফরাজ খান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অবন্তি বলল, পান দিব? পান খাবে? বেশি করে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে আরাম করে ঘুমুতে যাও। তোমার ঘুম দরকার।

সরফরাজ খান অনেক ঝামেলা করে অবন্তির মা'র চিঠি খাম থেকে বের করলেন। স্টিম দিয়ে গাম নরম করা, ব্লেড দিয়ে খামের মোড়ক খোলা। নানান ঝামেলা। অবন্তি যেন কিছুতেই টের না পায় যে খাম খোলা হয়েছিল।

অবন্তির মা'র চিঠি।

হ্যালো, প্রিটি!

তোমার শিক্ষকের স্কেচের হাত খুব ভালো শুনে আনন্দিত হয়েছি। তবে তাকে দিয়ে নগ্ন পোট্রেট করানোর কিছু নেই। সে পিকাসো না, মনেট না। সাধারণ গৃহশিক্ষক। তার সামনে কেন নিজেকে প্রকাশ করবে?

তাকে বিয়ে করলে ভিন্ন কথা। তখন সারাক্ষণ তার সামনে নেংটো হয়ে ঘুরবে, তখন দেখবে—ছবি আঁকা দূরে থাক, তোমার স্বামী ফিরেও তাকাচ্ছে না। মনে রেখো, চোখে যা দেখা যায় তা দ্রুত তার রহস্য হারায়। চোখে যা দেখা যায় না, যেমন 'মন', অনেক দিন রহস্য ধরে রাখে।

তোমার দাদাজানের বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে একটি কঠিন সাবধানবাণী উচ্চারণ করছি। এই সাবধানবাণী নিয়ে হেলাফেলা করবে না। তোমার দাদাজানের মতো সেক্স স্টারভড় বৃদ্ধেরা রূপবতী নাতনিদের প্রতি তীব্র লালসা পোষণ করে। তারা যে-কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায়। তুমি শুনলে নিশ্চয় চমকে উঠবে, আমি এই জাতীয় ঘটনার ভুক্তভোগী। আমার পুরো জীবন যে এলোমেলো হয়ে আছে অতীতের ভয়ংকর ঘটনা তার একটা কারণ। আমি চাই না আমার মেয়ের জীবন এলোমেলো হোক।

ইতি
ইসাবেলা

পুনশ্চ তোমার গৃহশিক্ষকের আঁকা যে পোট্রেটে তুমি অভিভূত তা আমাকে পাঠাও।

ইসাবেলার চিঠি হাতে অনেক রাত পর্যন্ত সরফরাজ বসে রইলেন। তার ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পর শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। বিছানায় শুতে গেলেন

শেষরাতের দিকে। আধো ঘুম আধো জাগরণে মনে হলো, বাড়িভর্তি বিড়াল। মিউ মিউ শব্দ করে অস্থির করে তুলছে।

৬. হাফেজ জাহাঙ্গীর

হাফেজ জাহাঙ্গীর ফজরের নামাজ শেষ করে দিঘির ঘাটে বসে আছেন। তার হাতে নীল রঙের ঘুটির তসবি। তিনি একমনে তসবি টানছেন। তার বসার জন্যে উলের আসন দেওয়া হয়েছে। তিনি যেখানে বসেছেন তার এক ধাপ নিচে আগরদানে আগরবাতি জ্বলছে। হাফেজ জাহাঙ্গীর আগরবাতির গন্ধ কখনো পছন্দ করেন না। তার নাক জ্বালা করে। তারপরেও তাকে বাস করতে হয় আগরবাতি চারপাশে নিয়ে।

আজ ভালো কুয়াশা হয়েছে। কুয়াশার কারণে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ভাদ্র মাসের ভোরে আবহাওয়া এমনিতেই কিছুটা শীতল থাকে। কুয়াশার কারণে আজ অন্যদিনের চেয়েও আবহাওয়া শীতল। হাফেজ জাহাঙ্গীরের শীত লাগছে। গায়ে একটা সুজনি দিতে পারলে হতো। সমস্যা হচ্ছে সুজনি আনার কথাটা কাউকে বলতে ইচ্ছা করছে না।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের সার্বক্ষণিক সঙ্গী নুরু তার পাশেই আছে। মাথা নিচু করে খেলাল দিয়ে দাঁত খোচাচ্ছে। তাকে বললেই সে আগরদান নিয়ে যাবে, সুজনি এনে গায়ে জড়িয়ে দেবে। এক বাটি খেজুর গুড়ের চা এনে সামনে রাখবে। হাফেজ জাহাঙ্গীর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। এই মুহূর্তে তার কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না।

নুরু বলল, ছছাট হুজুর, খবর পাইছেন আইজ পুসকুনিত জাল ফেলব?

জাহাঙ্গীর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। আজ দিঘিতে জাল ফেলা হবে, এই খবর তিনি পেয়েছেন। মাছ ধরা দেখার জন্যেই তিনি ফজরের ওয়াক্ত থেকে দিঘির ঘাটে বসে আছেন।

নুরু উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমার মন বলতাছে আইজ গুতুম ধরা পড়ব।

জাহাঙ্গীর বললেন, সবই আল্লাহর হুকুম। উনার হুকুম হইলে ধরা পড়ব। উনার হুকুম বিনা কিছু হবে না।

'গুতুম' হলো এই দিঘির সবচেয়ে বড় মাছের আদরের নাম। এই মাছের সাড়াশব্দ অনেকবার পাওয়া গেছে, এখনো কেউ তাকে দেখে নি। সবার ধারণা, গুতুম গজার মাছ। একমাত্র গজার মাছই দৈত্যাকৃতির হয়।

নুরু বলল, চা খাবেন? চা এনে দিব?

জাহাঙ্গীর বললেন, না। বলেই খুব অবাক হলেন। তাঁর চা খেতে ইচ্ছা করছে অথচ তিনি বলেছেন, না। এর মানে কী?

নুরু বলল, উরস-বিষয়ে আপনার হুকুম কী জানলে সেইমতো ব্যবস্থা নিতাম।

জাহাঙ্গীর হাতের তসবি নামিয়ে রেখে বললেন, কোনো হুকুম নাই।

বড় খানা কয়বার হবে?

একবারই হবে। আসরের নামাজের পরে বড় খানা।

গরু কয়টা জবেহ হবে?

উরস উপলক্ষে যে কয়টা এসেছে সবই জবেহ হবে।

চৌদ্দটা গরু এখন পর্যন্ত আছে, আরও আসবে ইনশাল্লাহ। সব একদিনে জবেহ করলে বিরাট বিপদ হবে।

কী বিপদ?

একসঙ্গে এত রান্না করা যাবে না।

জাহাঙ্গীর বললেন, উরস নিয়া তোমার সঙ্গে আলাপের কিছু নাই। আল্লাহপাক একেকজনকে একেক দায়িত্ব দিয়া পৃথিবীতে পাঠান। তোমাকে ফুটফরমাসের দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়েছেন। বুঝেছ?

জি।

ফজরের নামাজে তোমাকে সামিল হতে দেখি নাই। এর কারণ কী?

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। কাজা পড়েছি।

জাহাঙ্গীর বললেন, গত রাতে এশার নামাজেও তুমি শামিল হও নাই। কে কী করে বা করে না তা আমি জানি। এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও। আজ সারা দিন যেন তোমার চেহারা না দেখি।

নুরু মুখ শুকনা করে উঠে গেল।

জাল ফেলা হলো সকাল ন'টায়। হুলস্থুল ব্যাপার। সবাই এসে দিঘির ঘাটে ভিড় করেছে। জাহাঙ্গীর দেখলেন নিষেধ অমান্য করে নুরুও ঘাটে এসেছে। প্রতি তিন মাসে একবার জাল বাওয়া হয়। জাল বাওয়ার দৃশ্য সে কারণেই আনন্দময়। বাড়তি আকর্ষণ 'গুতুম'। গত এক বছর ধরে গুতুম ধরা পড়বে এমন অপেক্ষা।

জাল টানা শেষ হলো বারোটার দিকে। জাল এখনো পানির নিচে। প্রধান জেলে এসে হাফেজ জাহাঙ্গীরকে ফিসফিস করে বলল, গুতুম আটক হয়েছে।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, গুতুম ধরা পড়েছে এ তো ভালো সংবাদ। কানাকানি করছ কেন? মাছ তোলো, দেখি কী সমাচার।

মাছ ধরার সময় মহিলা মাদ্রাসার কেউ বা জেনানামহলের কেউ থাকে না। আজ সবাই ছুটে এসেছে। কঠিন পর্দার কথা মনে হয় সাময়িকভাবে ভুলে গেছে। কিছু কিছু অনিয়ম উপেক্ষা করতে হয়। হাফেজ জাহাঙ্গীর তা-ই করছেন।

গুতুমকে ডাঙায় তোলা হয়েছে। বিস্ময়কর এক দৃশ্য! দানবাকৃতির এক কাতল মাছ। কাতল মাছের মাথা শরীরের তুলনায় বড় হয়। এর মাথা ছোট। ঘাড়ের কাছের খানিকটা অংশ সোনালি। হাফেজ জাহাঙ্গীর পর পর তিনবার বললেন, সোবাহানআল্লাহ! আল্লাহপাকের তরফ থেকে এমন চমৎকার নিয়ামত পাঠানোর জন্যে দুই রাকাত নফল নামাজ পাঠ করা হলো।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে মাছ ওজন করে হুজরাখানার গেটে দুই ঘণ্টার জন্যে রাখা হলো। অনেকেই এই মাছ দেখতে চাইবে। তারা দেখবে।

মাছের ওজন মাপা হয়েছে। এক মণ তিন সের। এই মাছ বিষয়ে সাপ্তাহিক ময়মনসিংহ বার্তায় ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়।

খতিবনগর হুজরাখানায়
অদ্ভুত কাতল
(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

খতিবনগর হুজরাখানায় এক মণ তিন সের ওজনের এক দৈত্যাকৃতি কাতল মাছ ধরা পড়েছে। এমন বৃহৎ কাতল স্মরণাতীতকালে কেউ দেখেছে এমন নজির নাই। খতিবনগরের আশি বয়স বর্ষীয়ান বৃদ্ধ হেকমত আলি বলেন তার কৈশোরে তিনি হাওর থেকে ধৃত এমন কাতল দেখেছেন। হুজরাখানায় ধৃত কাতলের মতো সেই কাতলেরও নাকি গলা ছিল হরিদ্রা বর্ণের এবং মাথা ছিল শরীরের তুলনায় অপুষ্ট।

হুজরাখানার বর্তমানে গদিনসীন পীর হাফেজ জাহাঙ্গীর খতিবি এই মাছ হুজরাখানার ভক্তদের খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। হুজরাখানা সূত্রে জানা যায়, ভৈরবের বিখ্যাত মনা বাবুর্চির উপর এই মাছ রান্ধনের দায়িত্ব পড়েছে। অদ্য বৃহস্পতিবার নৈশভোজে হুজরাখানার তরফ থেকে ভক্তদের জন্যে মাছ ভাত এবং মাষকলাইয়ের ডালের আয়োজন করা হয়েছে।

এশার নামাজের পর রাতের খানা। হাফেজ জাহাঙ্গীর ফরজ নামাজ শেষ করে সুন্নত নামাজে যাবেন, এইসময় তার কাছে খবর গেল ঢাকা থেকে তাঁর স্ত্রী মায়মুনা এসেছেন। তিনি একা। তার সঙ্গে কেউ নেই। হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, সোবাহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ। তিনি অনেক কষ্টে সুন্নত নামাজ শেষ করলেন। তার ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করলেই তা সম্ভব না। আল্লাহপাক মায়মুনাকে উপস্থিত করেছেন। তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। শুকরানা নামাজ পড়তে হবে। কোনো কিছুতেই তাড়াহুড়া করা যাবে না। আল্লাহপাক মানবসমাজের তাড়াহুড়া পছন্দ করেন না বলেই পবিত্র কোরান শরিফে বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'হে মানব সমাজ! তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

অবন্তির কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গা অবশ্যই আছে যা কখনো বদলাবে না। খতিবনগর হুজরাখানা তার একটি। সব আগের মতো। এমনকি গন্ধও আগের মতো। মনে হচ্ছে কারও বয়সও বাড়ে নি।

সালমা তাকে দেখে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে অবন্তির গোসল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হুজরাখানার নিয়ম হলো বাইরে থেকে আসা কোনো মহিলা হুজরাখানার জেনানামহলে ঢোকার আগে সিনান করবে। পাকপবিত্র হয়ে আল্লাহপাকের নিরানব্বই নাম জপ করে জেনানামহলে ঢুকবে। এতে মহিলাদের সঙ্গে আসা দুষ্ট জ্বিন জেনানামহলে ঢুকতে পারবে না।

অতি অল্পসময়ে সালমা হুজুরাখানার যাবতীয় খবর দিয়ে ফেলল। তার গল্পের বড় অংশ জুড়েই রইল দৈত্যাকৃতির কাতল মাছ।

সালমা বলল, মাছ মনে হয় না স্বাদ হবে। বেশি বড় মাছ স্বাদ হয় না। তা ছাড়া মানুষের নজর লাগে।

অবন্তি বলল, মাছ স্বাদ হোক বা না-হোক, আমি মাছ খাব না। আমি মাছ খাই না। গন্ধ লাগে।

সালমা বলল, ছছাট হুজুর হাফেজ জাহাঙ্গীরও আপনার মতো মাছ খান না। উনি মাছ খান না অন্য কারণে।

কী কারণে?

আমাদের নবিজি মাছ খেতেন না। এইজন্যে হাফেজ সাহেবও মাছ খান না। তবে আজ মনে হয় খাবেন।

বড় মাছ, এইজন্যে খাবেন?

উনি সবাইরে মাছ খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দিলে মেহমানদের সঙ্গে খানা খেতে বসতে হয়।

জুলেখা বিবি অবন্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনিও আগের মতোই আছেন। একটা টকটকে লাল রঙের শাড়িতে তাঁকে কোনোরকমে ঢেকে রাখা হয়েছে। তাঁর তিনজন দাসীর একজন পায়ের আঙুল টানছে।

জুলেখা বিবি বললেন, চেহারা দেখাইতে আসছ, না জনের মতো আসছ?

অবন্তি বলল, চেহারা দেখানোর জন্যে এসেছি।

চেহারা দেখলাম। এখন বিদায় হও।

আচ্ছা চলে যাব।

জুলেখা বিবি হঠাৎ গা থেকে শাড়ি ফেলে নগ্ন হয়ে গেলেন। দাসী দু'জন শাড়ি দিয়ে গা ঢাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেল। জুলেখা বিবি বললেন, গরমে শইল পুইড়া যাইতেছে। শাড়ি শইল্যে দিবা না। আর যে মেয়ে নিজের স্বামী ছাইড়া অন্যত্র বাস করে সে পশুর সমান। পশুর সামনে কোনো লজ্জা নাই। এখন বুঝেছ?

মেহমানরা সবাই দস্তরখান বিছিয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খানা দেওয়া হবে। হাফেজ জাহাঙ্গীরের জন্যে অপেক্ষা। তিনি হুজরাখানায় একা বসে আছেন। বিশেষ কোনো নামাজে বসেছেন। বিশেষ নামাজের সময় বাতি নেভানো থাকে। এবং তিনি থাকেন একা। আজ হুজরাখানার বাতি নেভানো। তিনি ছাড়া আর কেউ হুজরাখানায় উপস্থিত নেই।

অতিথিরা যখন খাবারের জন্যে অস্থির তখন হাফেজ জাহাঙ্গীর দর্শন দিলেন। অতিথিদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত গলায় বললেন, আমি বিশেষ শরমিন্দা। যে মাছ খাওয়ার জন্যে আমি আপনাদের দাওয়াত দিয়েছি, সেই মাছ খাওয়াতে পারছি না। কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি বাতেনি খবর পেয়েছি যে, মাছ রান্নার সময় মাছে বিষ দেওয়া হয়েছে। ভৈরবের মনা বাবুর্চি এই কাজ করেছে। সে পলাতক আছে। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি মাছের সব সালুন গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, আর এক ঘণ্টা যদি অপেক্ষা করেন তাহলে খাসি জবেহ করে খাসির সালুন দিয়ে আপনাদের খানা দিব। এখন আপনাদের বিবেচনা।

অতিথিরা কেউ কোনো শব্দ করলেন না।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অবন্তির দেখা হলো অনেক রাতে। অতিথিরা খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার পর। অতিথিরা খাসির সালুনের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মাছের অভাবে তাদের তেমন কষ্ট হলো না। কারণ খাসির সালুন অসাধারণ স্বাদ হয়েছিল।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, তোমাকে দেখে অবাক হয়েছি। তুমি একা চলে এসেছ।

অবন্তি বলল, আমি একা তো আসি নাই। আমার সঙ্গে দুইজন চড়নদার ছিল।

জাহাঙ্গীর অবাক হয়ে বললেন, বলো কী? তারা পুরুষ?

অবন্তি হাই তুলতে তুলতে বলল, তারা পুরুষও না, রমণীও না। তাঁরা দুজন ফেরেশতা। সব মানুষের কাঁধে বসে থাকে।

ও আচ্ছা বুঝেছি। কেরামন কাতেবিন। তোমার সাহস দেখে চমকায়েছি। হুজরাখানার দিকে তোমার টান দেখেও ভালো লেগেছে।

অবন্তি বলল, হুজরাখানার প্রতি বা আপনার প্রতি আমার কোনো টান নাই। আমার এখানে চলে আসার একটাই কারণ—দাদাজানকে শিক্ষা দেওয়া। তিনি সারাক্ষণ আমার ওপর নজরদারি করেন, এটা আমার ভালো লাগে না। আমার জন্যে আমিই যথেষ্ট, এটা উনাকে বুঝাতে চাই। এখন কি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়েছে আমি কেন খতিবনগরে এসেছি?

পরিষ্কার হয়েছে।

আপনি আবার স্বামীর অধিকার ফলানোর জন্যে নিশিরাতে আমার ঘরে উপস্থিত হবেন না। আমি আপনাকে স্বামী স্বীকার করি না।

জাহাঙ্গীর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি উপস্থিত হব না।

অবন্তি বলল, তবে আমি আপনার সঙ্গে খানা খাব। আপনার সঙ্গে খানা খেতে আমার অসুবিধা নাই। মাছ আমি পছন্দ করি না, তবে আজ কাতল মাছের সালুন দিয়ে ভাত খাব।

জাহাঙ্গীর বললেন, মাছে বিষ মিশানো হয়েছে, এই খবর পাও নাই?

অবন্তি বলল, পেয়েছি। এটা ভুয়া খবর। মাছে বিষ মিশানোর কথা আপনি বলেছেন যেন সবাই বুঝে আপনি বাতেনি খবর পান। খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনার অন্যায় আপনি দেখবেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু মাছের সালুন দিয়ে ভাত খেয়ে দেখাব যে, মাছে কেউ বিষ দেয় নাই।

মাছের সালুন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

অবন্তি বলল, তার আগেই আমি দুইটা পেটি আনিয়ে রেখেছি। একটা আপনি খাবেন, আরেকটা আমি। সালমাকে খানা দিতে বলি। আমার ভুখ লেগেছে। সারা দিন কিছু খাওয়া হয় নাই।

হাফেজ জাহাঙ্গীর নিঃশব্দে রাতের খাওয়া খেলেন। কাতল মাছের বিশাল পেটির অর্ধেকটা শেষ করলেন।

অবন্তি বলল, এত স্বাদের মাছ আমি কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। দাদাজানকে এই মাছের এক টুকরা খাওয়াতে পারলে ভালো হতো। উনি মাছ খুব পছন্দ করেন।

জাহাঙ্গীর বললেন, তোমার দাদাজানের রাতের খানা শেষ হয়েছে। তিনি খাসির সালুন দিয়ে তৃপ্তি করে খেয়েছেন।

দাদাজান আমার খোঁজে চলে এসেছেন?

হ্যাঁ। তাঁকে থাকার জন্যে হুজরাখানায় একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। নিজের বাড়িতে তার থাকার উপায় নাই। বাড়িঘর দখল হয়ে গেছে।

কে দখল করেছে?

শহর-বন্দরের চেয়ে মফস্বলে দুষ্ট লোক বেশি। তাদেরই একজন। নাম ছানু ভাই।

অবন্তি বলল, ছানু ভাই কি আপনার চেয়েও দুষ্ট?

হাফেজ জাহাঙ্গীর জবাব দিলেন না। আহত চোখে অবন্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার বারবার মনে হচ্ছিল–তার সামনে কোনো মানবী বসে নেই, আয়তলোচনা বেহেশতের হুর বসে আছে। যাকে কোনো পুরুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নি।

ছানু ভাই হাসিখুশি মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। বেঁটে গোলগাল চেহারা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা বাবরি চুল। অমায়িক কথাবার্তা।

ছানু ভাই সরফরাজ খানের সঙ্গে কোলাকুলি করে গাঢ় স্বরে বলল, ভাইসাহেব, কেমন আছেন? বাড়িঘরের কথা মনে পড়ে না? আফসোস।

সরফরাজ খান বললেন, বাড়িঘর তো সব আপনি দখল নিয়ে নিয়েছেন। মনে পড়লেই বা কী, না পড়লেই কী?

ছানু ভাই ব্যথিত গলায় বললেন, আমি যদি দখল নিয়ে থাকি তাহলে দশজনের মোকাবিলায় আমারে এক শ' বার জুতাপেটা করেন। বাড়িঘর খালি পড়ে ছিল। গরু-ছাগলের আস্তানা হয়ে ছিল সেখানে। আমি মুজিব সেন্টার করেছি। মুজিব সেন্টারে বঙ্গবন্ধু এবং বাকশাল নিয়ে গবেষণা হবে। এতে আপনার পাপ কাটা যাবে।

সরফরাজ খান অবাক হয়ে বললেন, আমার পাপ কাটা যাবে মানে? আমার কী পাপ?

ছানু ভাই শান্ত গলায় বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি শান্তি কমিটির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, সেই পাপ। খতিবনগরের পীর সাহেব ছিলেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। আপনি তার মুরিদ হয়েছিলেন। নিজ নাতনিকে এক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই ইতিহাস তো কারও অজানা না। তারপরেও আপনাকে ছোটভাই হিসেবে একটা পরামর্শ দেই। আপনি বঙ্গবন্ধুর কাছে আমার নামে নালিশ করেন। কীভাবে আমি আপনার বিষয়সম্পত্তি সব দখল করেছি সেটা বলেন। বঙ্গবন্ধু যে হুকুম দেন তা মাথা পেতে নিব। আমার নাম বললেই উনি আমাকে চিনবেন। উনার জন্যে আজ সকালেই জিয়ল কই মাছ পাঠিয়েছি।

সরফরাজ খান বললেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। আমি উনাকে জানাব। ছানু ভাই বলল, ভাই সাহেবকে একটা সত্য কথা বলি? উনাকে জানালে কিছুই হবে না। উনার কানে লাখ লাখ নালিশ। এত নালিশ শুনলে উনার পুষবে না। ভাইসাহেব এখন বলেন, চা খাবেন নাকি কফি খাবেন? মুজিব সেন্টারে চাকফি দু'টারই ব্যবস্থা আছে।

৭. বেলা দুটা চল্লিশ

বেলা দুটা চল্লিশ। ভাদ্র মাসের কঠিন ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। ফ্যানের বাতাসও গরম।

বঙ্গবন্ধু পাইপ হাতে তাঁর প্রিয় আরামকেদারায় এসে শোয়ামাত্র মাথার ওপরের ফ্যান বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত মুখে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। ভেবেছিলেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। শরীর ক্লান্ত, মনও ক্লান্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শত সমস্যা। সবই সমাধানের দায়িত্ব তার। এটা কি সম্ভব? তিনি আলাদিনের চেরাগ নিয়ে আসেন নি। দেশের সব পত্রপত্রিকার ধারণা, তার কাছে চার-পাঁচটা আলাদিনের চেরাগ আছে। চেরাগগুলি তিনি রিলিফের কম্বলের নিচে লুকিয়ে রেখেছেন। এই যে কারেন্ট চলে গেল, এই নিয়ে কোনো-না-কোনো পত্রিকায় লেখা হবে–মুজিবের লোকদের দুর্নীতিতে ইলেকট্রিসিটির বেহাল অবস্থা। তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই। সবাই আছে খাল কাটায়। নিতান্ত ঘনিষ্ঠজনরাও এখন খাল কাটতে শুরু করেছে। খাল কাটছে আর দাঁতাল কুমির ছেড়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় খাল কাটা ধরেছে আবদুর রব। বলতে গেলে সে ছিল তার হাতের পাঁচ আঙুলের এক আঙুল। সেই আবদুর রবের এত সাহস—পল্টনের মাঠে তার সমালোচনা করে বক্তৃতা দেয়! এই কাজ তো মাওলানা ভাসানীও এখনো করেন নি। আবদুর রব পল্টনের বক্তৃতায় প্রমাণ করার চেষ্টা করে শেখ মুজিব ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি এখন পা-চাটাদের প্রধান। তার সব মমতা এখন পা-চাটাদের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে না।

আরে ব্যাটা! তুই সেদিনের ছেলে। হা করলে এখনো তোর মুখ থেকে দুধের গন্ধ বের হয়। তুই রাষ্ট্রপরিচালনার বুঝিস কী? গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে পারা মানেই রাষ্ট্রপরিচালনা

না। তুই মনে রাখিস, এক চোপড় দিয়ে তোকে ঠিক করতে পারি। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! তুই তো মশারও অধম।

বঙ্গবন্ধু পাইপে টান দিলেন। পাইপ নিভে গেছে। পাইপ থেকে কোনো ধোয়া বের হলো না। নতুন করে পাইপ ধরাবার ইচ্ছেও হচ্ছে না। কয়েক মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করতে পারলে হতো। গরমে তাও সম্ভব না। তিনি মাথার ওপরের ফ্যানের দিকে তাকাতেই ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। হাত থেকে পাইপ মেঝেতে পড়ে গেল।

ঠিক ঘুম না, গাঢ় তন্দ্রার মতো এসেছে। তার এই অংশ থাকে দুঃস্বপ্নে ভরা। তিনি ছটফট করছেন। চোখের সামনে এখন আজরাইলকে দেখছেন। আজরাইল দেখতে মানুষের মতো, তবে শরীরভর্তি লাল লোম। সাইজেও ছোট, বামনদের মতো। মুখে চার পাটি করে দাঁত। হাসলে ভেতরের পাটির দাঁত দেখা যায়।

পাকিস্তানের জেলখানায় তিনি বন্দি। তার চোখের সামনে তার জন্যে কবর খোড়া হচ্ছে। কবর খুঁড়ছে মিলিটারিরা। একজন জেনারেল নির্দেশ দিচ্ছেন— Deep, Deep. জেয়াদা Deep. আজরাইলটা আছে জেনারেলের সঙ্গে। সে জেনারেলের প্রতিটি কথায় সায় দিচ্ছে। চার পাটি দাত বের করে হাসছে।

এর মধ্যে একজন আবার চিৎকার করছে-ভাত চাই, ভাত দাও। কাপড় চাই, কাপড় দাও।' যে চিৎকার করছে তার গলা পরিচিত। ছাত্রনেতা আবদুর রব। এ আবার পাকিস্তানে এসেছে কবে! পাকিস্তানিদের কাছে সে ভাত চাচ্ছে কেন? পাকিস্তানিরা তাকে ভাত দেবে?

বঙ্গবন্ধুর তন্দ্রা কেটে গেল। তার বাড়ির উঠানে সত্যি সত্যি ভাত-কাপড় চেয়ে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। নেতৃত্বে আছে আবদুর রব। বঙ্গবন্ধু মেঝে থেকে পাইপ কুড়িয়ে নিয়ে পাইপ ধরালেন। তিনি মহাবিরক্ত। তার নিজের লোকজন কোথায়? বাড়ির ভেতর ভাত-কাপড়ের মিছিল হতে দেওয়া যায় না। ভাবমূর্তির ব্যাপার আছে। বিদেশি সাংবাদিকদের কেউ-না-কেউ আছেই। বসার ঘরে নিশ্চয়ই আছেন কূটনীতিকদের কেউ। একষট্টি জেলায় গভর্নর নিয়োগ প্রায় চূড়ান্ত। এরা সারাক্ষণই তাকে ঘিরে আছে। সবার ধারণা, চোখের আড়াল হলেই তারা বাদ পড়বে।

গভর্নরদের বিপক্ষের লোকজনও আছে। তাদের চেষ্টা ভাংচি দেওয়া। এরচেয়ে বড় সমস্যা দেনদরবারের লোকজন। বেশির ভাগই আসে মিলিটারির হাত থেকে আত্মীয়স্বজন ছাড় করানোর জন্যে।

দুষ্কৃতিকারীদের ধরার দায়িত্ব মিলিটারিদের হাতে দেওয়া মনে হয় ভুল হয়েছে। আসল দুষ্কৃতি ধরার নাম নেই, বেছে বেছে এরা ধরছে আওয়ামী লীগের নিবেদিত কর্মীদের। সর্বহারা কেউ তো মিলিটারির হাতে ধরা পড়ছে না। সিরাজ শিকদারকে কি মিলিটারি ধরেছে? ধরেছে পুলিশ। মিলিটারি নামেই মিলিটারি। কাজে লবডংকা।

যতই দিন যাচ্ছে মিলিটারির ওপর বঙ্গবন্ধু ততই বিরক্ত হচ্ছেন। মিলিটারি হচ্ছে দানববিশেষ। পাকিস্তানি মিলিটারি যেমন দানব, বাংলাদেশি মিলিটারিও তা-ই। সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড যদি কোনো কারণে স্বাধীন হয়, তাদের মিলিটারি হয়, তারাও হবে দানব।

বঙ্গবন্ধু পঁচিশ বছরের জন্যে ভারতের সঙ্গে দেশরক্ষা চুক্তি করেছেন। এখন আর মিলিটারির প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে মিলিটারিদের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। এমনভাবে করতে হবে

যেন এরা বুঝতে না পারে। এক ভোরবেলা ঘুম ভেঙে এরা দেখবে, তাদের বুটের নিচে মাটি নেই। বুটের নিচে চোরাবালি। তারা ধীরে ধীরে চোরাবালিতে ডুবতে থাকবে। দানবকে মানব বানানোর এই একটাই উপায়।

পাইপ হাতে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। এখন এক এক করে দর্শনার্থী বিদায় করার পালা। সেদিন তিনি যাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং যে ব্যবস্থা নিলেন তার তালিকা দেওয়া হলো—

১. নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগার মোজাম্মেলের আত্মীয়স্বজন

মোজাম্মেল ধরা পড়েছে মেজর নাসেরের হাতে। স্থান : টঙ্গি।

বঙ্গবন্ধু ঘরে ঢোকামাত্র মোজাম্মেলের বাবা ও দুই ভাই কেঁদে বঙ্গবন্ধুর পায়ে পড়ল। টঙ্গী আওয়ামী লীগের সভাপতিও পায়ে ধরার চেষ্টা করলেন। পা খুঁজে পেলেন না। পা মোজাম্মেলের আত্মীয়স্বজনের দখলে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, ঘটনা কী বলে?

টঙ্গি আওয়ামী লীগের সভাপতি বললেন, আমাদের মোজাম্মেল মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে। মেজর নাসের তাকে ধরেছে। নাসের বলেছে, তিন লাখ টাকা দিলে ছেড়ে দিবে।

মিথ্যা মামলাটা কী?

মোজাম্মেলের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, খুনের মামলা লাগায়ে দিয়েছে।

টঙ্গী আওয়ামী লীগের সভাপতি বললেন, এই মেজর আওয়ামী লীগ শুনলেই তারাবাতির মতো জ্বলে ওঠে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে—টঙ্গিতে আমি কোনো আওয়ামী লীগের বদ রাখব না।

বঙ্গবন্ধু! আমি নিজেও এখন ভয়ে অস্থির। টঙ্গিতে থাকি না। ঢাকায় চলে এসেছি। (ক্রন্দন)।

বঙ্গবন্ধু বললেন, কান্দিস না। কান্দার মতো কিছু ঘটে নাই। আমি এখনো বেঁচে আছি। মরে যাই নাই। ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তিনি মোজাম্মেলকে তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। মেজর নাসেরকে টঙ্গি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দেওয়া হলো।

মূল ঘটনা (সূত্র : Bangladesh Legacy of Blood, Anthony Mascarenhaas) এক নবদম্পতি গাড়িতে করে যাচ্ছিল। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মোজাম্মেল দলবলসহ গাড়ি আটক করে। গাড়ির ড্রাইভার ও নববিবাহিত তরুণীর স্বামীকে হত্যা করে। মেয়েটিকে সবাই মিলে ধর্ষণ করে। মেয়েটির রক্তাক্ত ডেড বডি তিন দিন পর টঙ্গি ব্রিজের নিচে পাওয়া যায়।

মেজর নাসেরের হাতে মোজাম্মেল ধরা পড়ার পর মোজাম্মেল বলল, ঝামেলা করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে তিন লাখ টাকা দেব। বিষয়টা সরকারি পর্যায়ে নেবেন না। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি ছাড়া পাব। আপনি পড়বেন বিপদে। আমি তুচ্ছ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে জড়াতে চাই না।

মেজর নাসের বললেন, এটা তুচ্ছ বিষয়?

মোজাম্মেল জবাব দিল না। উদাস চোখে তাকাল।

মেজর নাসের বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করব। তোমার তিন লাখ টাকা তুমি তোমার গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে রাখো।

মোজাম্মেল বলল, দেখা যাক।

মোজাম্মেল ছাড়া পেয়ে মেজর নাসেরকে তার বাসায় পাকা কাঁঠাল খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল।

২. উজবেক তরুণী ডোরা রাসনা

এই অসম্ভব রূপবতী তরুণী রুবাব নামের এক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসেছে। সে একজন গায়িকা ও গীতিকার। সে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি গান রচনা করেছে। গানটি শোনাতে চায়।

বঙ্গবন্ধু আগ্রহ নিয়ে গান শুনলেন। গান শুনে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি রুমালে চোখ মুছলেন। ডোরা রাসনা বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে বেশ কিছু ছবি তুলল। বঙ্গবন্ধু ডোরা রাসনাকে উপহার হিসেবে রুপার একটি নৌকা দিলেন। উজবেক তরুণীর গানের কয়েকটি চরণ—

তুমি বঙ্গের বন্ধু শুধু নও
পৃথিবীর সব নিপীড়িত জনতার বন্ধুও হও।
হে বন্ধু। তোমার বিশাল হৃদয়ে আমাদের স্থান দাও
যাতে আমরা দুঃখ-কষ্ট ভুলে মনের আনন্দে
নৃত্যগীত করতে পারি।

৩. ছানু ভাই

ছানুর বাড়ি ময়মনসিংহের সোহাগীতে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার একবারই দেখা হয়েছিল। সে প্রায় দশ মিনিট বঙ্গবন্ধুর পা ধরে বসে ছিল। বঙ্গবন্ধু অনেক চেষ্টা করেও ছানুর হাত থেকে পা উদ্ধার করতে পারেন নি। ছানু ভাইয়ের আপন লোক আবু বক্কর তিন ঘণ্টা হলো হলঘরে বসে আছে। একসময় বঙ্গবন্ধু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কে?

আমি আবু বক্কর।

কুষ্টিয়ার আবু বক্কর?

জে-না। মইমনসিংহের।

তোর সঙ্গে আগে কি আমার দেখা হয়েছে?

জে-না। তয় আমার ওস্তাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। ওস্তাদের নাম ছানু ভাই।

সোহাগীর ছানু?

জে।

কেরোসিনের দুই টিন নিয়ে বসে আছিস, কেরোসিনের টিনে আছে কী? কেরোসিন? আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবি?

টিনে করে আপনার জন্যে কই মাছ এনেছি।

সাইজ কী?

এক বিঘৎ সাইজ।

সাইজ খারাপ না। এক বিঘৎ কই মাছ অনেক দিন খাই না। ছানু চায় কী আমার কাছে?

কিছু চায় না।

সবাই কিছু-না-কিছু চায়। ছানু চায় না?

জে-না।

সে করে কী এখন?

আপনারে নিয়া আছেন। মুজিব সেন্টার করেছেন।

বঙ্গবন্ধু বেশ কিছুক্ষণ ঠা ঠা করে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, ছানু বিরাট ধড়িবাজ। মতলব ছাড়া সে কিছু করে না। কই মাছেও তার মতলব আছে। যা, কই মাছ ভেতরের বাড়িতে দিয়ে আয়। সবগুলা যেন ভাজে। আজ উপস্থিত যারা আছে সবাই এক পিস কই মাছ খাবে। শুধু তুই খাবি না। তুই কই মাছ খাওয়া দেখতে এসেছিস, তুই শুধু দেখবি।

জে আচ্ছা।

রিলিফের কম্বল কি পেয়েছিস?

জে-না।

কোটি কোটি রিলিফের কম্বল এসেছে, আর তুই পাস নাই! আমার চারপাশে আছে চাইট্যা খাওয়ার দল। রিলিফের সব কম্বল এরাই চেটে খেয়ে ফেলেছে। তুই আর কী পাবি? যাই হোক, আমি বলে দিচ্ছি দুটা ভালো কম্বল যেন পাস।

৪. সতেরজন সম্ভাব্য জেলা গভর্নর

এঁরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চান। এরা কেউ অন্যের সামনে মুখ খুলবেন না। বঙ্গবন্ধু তাদের কারোর সঙ্গেই কথা বললেন না। তবে প্রত্যেককে কই মাছ

ভাজা খেয়ে যেতে বললেন। তারা সবাই মুখ ভোঁতা করে ভাজা কই মাছের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৫. খন্দকার মোশতাক

তিনি কাঠের বাক্সে করে বঙ্গবন্ধুর জন্যে বিশেষ এক উপহার নিয়ে এসেছেন। একুশ ভরি সোনায় বানানো বটগাছ। নিচে লেখা—'বটবৃক্ষ শেখ মুজিব'। তার নিচে লেখা—'আগামসি লেন স্বর্ণকার সমিতি'।

মোশতাক বললেন, সবাই আপনাকে দেয় নৌকা। এরাও নৌকা বানাতে চেয়েছিল। আমি বললাম, গাধারা! বটগাছ বানা। বঙ্গবন্ধু আমাদের বটবৃক্ষ। আমরা আছি তার ছায়ার নিচে।

বঙ্গবন্ধু স্বর্ণের বটগাছ দেখে আনন্দ পেলেন।

খন্দকার মোশতাক বললেন, বাজারে চালু গুজবটা কি শুনেছেন?

কী গুজব?

তাজউদ্দিনকে আপনি নাকি আবার মন্ত্রীসভার সদস্য করছেন।

কী আশ্চর্য কথা!

খন্দকার মোশতাক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই গুজব তাজউদ্দিন নিজেই ছড়াচ্ছে। যাতে আবার ফিরে আসতে পারে।

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

খন্দকার মোশতাক বললেন, অন্য কারও বিষয়ে আপনার সাবধান হওয়ার প্রয়োজন নাই। তাজউদ্দিনের বিষয়ে শুধু সাবধান থাকবেন।

৬. রাধানাথ বাবু

রাধানাথ বাবুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি বিশেষভাবে চাচ্ছে তিনি যেন দেখা করেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আপনাকে কি আমি চিনি?

বঙ্গবন্ধু অনেক বৃদ্ধকেও 'তুই' করে বলেন। রাধানাথ বাবুর সৌম্য চেহারা মনে হয় বাধ সাধল। তাঁকে তিনি 'আপনি করে বললেন।

রাধানাথ বললেন, আপনি আমাকে চেনেন না। আপনার সঙ্গে পরিচয় থাকার মতো যোগ্যতা আমার নেই।

আপনি কে?

আমার নাম রাধানাথ। আমার একটা ছাপাখানা আছে। ছাপাখানার নাম ‘আদর্শলিপি।

আমার কাছে কী? আমি একজন হস্তরেখাবিদ। আমি আপনার হাত দেখতে এসেছি।

আমার হাত দেখে কী করবেন? আমার কর্ম দেখুন। সাধুর বিচার ধর্মে, পুরুষের বিচার কর্মে।

রাধানাথ বললেন, জনাব, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। আপনার সামনে মহাবিপদ।

হাত না-দেখেই আপনি আমার মহাবিপদে টের পেয়ে গেলেন? ভালো কথা, আপনি কি কোনোভাবে ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসির সঙ্গে যুক্ত?

জি-না জনাব। তবে ইন্ডিয়া বিশাল দেশ। এই দেশ শুধু যে অ্যাম্বাসির মাধ্যমে কাজ করে তা না। তার আরও প্রক্রিয়া আছে।

আপনি কি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত?

হ্যাঁ। আপনাকে আমার সাবধান করার কথা। আমি তা করলাম। আপনার সবচেয়ে বড় ভরসা বাংলাদেশের মানুষ। আপনার মহাবিপদে তারা কিন্তু আপনাকে ত্যাগ করবে। আপনার পাশে থাকবে না।

বঙ্গবন্ধু বিরক্ত ও তিক্ত গলায় বললেন, ইন্ডিয়ান কারও পক্ষে বাংলাদেশের মানুষ চেনার কথা না। আমি আমার মানুষ চিনি।

জনাব। কিন্তু আমি বাংলাদেশের মানুষ। আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ।

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

অপ্রয়োজনীয় কথা শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় কথাটা বাকি আছে।

প্রয়োজনীয় কথা বলে চলে যান। আমি অসম্ভব ব্যস্ত। ভালো কথা, কই মাছ খাওয়ার নিমন্ত্রণ। কই মাছ ভাজা হচ্ছে। এক পিস খেয়ে যাবেন। এখন বলুন আপনার প্রয়োজনীয় কথা।

খন্দকার মোশতাক বিষয়ে আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। ইনি চেষ্টায় আছেন আপনাকে সরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ফেডারেশন জাতীয় কিছু করার।

বঙ্গবন্ধু বিরক্ত গলায় বললেন, খন্দকার মোশতাককে আপনি চেনেন না। আমি চিনি। আমি যদি তাকে বলি, এক মাস ঘাস খেতে হবে, সে দু'মাস ঘাস খাবে।

রাধানাথ বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমরা সবাই ঘাস খাওয়া শিখলে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধান হয়ে যেত।

বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। এই আধাপাগলকে সময় দেওয়াই ভুল হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মন খারাপ করে ৩২ নম্বর বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মন ভালো হয়ে গেল। উঠানভর্তি মানুষ। ভুখা মিছিলের মানুষ না। সাধারণ মানুষ, যারা বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখতে এসেছে।

স্লোগান শুরু হলো, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন।

ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা অতি সুপুরুষ এক যুবক দামি ক্যামেরায় মিছিলের ছবি তুলছে। যুবক একপর্যায়ে ইশারায় বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার অনুমতি প্রার্থনা করল। বঙ্গবন্ধু উচ্চস্বরে বললেন, ছবি তুলতে চাইলে তুলবি। অনুমতির ধার ধারবি না।

যুবককে বঙ্গবন্ধুর পরিচিত মনে হচ্ছে। তবে তিনি তার নাম মনে করতে পারছেন না। হঠাৎ হঠাৎ তার এ রকম হয়, নাম মনে আসে না।

যুবক এসে বঙ্গবন্ধুকে কদমবুসি করল। বঙ্গবন্ধু বললেন, কই মাছ খেয়ে যাবি। কই মাছ ভাজা হচ্ছে।

যুবকের নাম ফারুক। সে এসেছে রেকি করতে। মূল আক্রমণের সময় কোন গানার কোথায় থাকবে তা জানা থাকা দরকার।

বাড়ি আক্রান্ত হলে পালাবার পথগুলো কী কী তাও জানা থাকা দরকার। ধানমন্ত্রি পুরনো বাড়িগুলোতে মেথর প্যাসেজ বলে এক কাঠার মতো ফাঁকা জায়গা থাকে। এ বাড়িতেও নিশ্চয়ই আছে। মেথর প্যাসেজ দিয়ে কেউ যেন পালাতে না পারে।

৮. একটি বিশেষ গুজব

একটি বিশেষ গুজবের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দময় চাপা উত্তেজনা। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব হতে যাচ্ছে। উৎসবের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শোনা যাচ্ছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আলাদা মর্যাদা পাবেন। তাদের বেতন বৃদ্ধি ঘটবে। সবার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যারা বাসা পাবেন না, তাদের এমনভাবে বাড়িভাড়া দেওয়া হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশেই বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা হবেন অতিরিক্ত মর্যাদার শিক্ষক।

এখানেই শেষ না, আরও আছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রস্তাব করা হবে যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আজীবন প্রেসিডেন্ট হন। বঙ্গবন্ধু এই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এত কিছু পাচ্ছেন, তার বিনিময়ে কিছু তাঁদের দিতে হবে। এটাই দ্রতা এবং শিষ্টতা। শিক্ষকেরা সবাই এদিন বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল'-এ যোগদান করবেন। সব শিক্ষকের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামা একটি রুপার নৌকার খোলের ভেতর ভরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামায় দস্তখত সংগ্রহ এর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে আগ্রহের কোনো কমতি দেখা গেল না। ক্ষমতার সুনজরে থাকা ভাগ্যের ব্যাপার। হাতেগোনা কিছু শিক্ষক অবশ্যি বাকশালে যোগদানে রাজি হলেন না।

তারা ভীত এবং চিন্তিতমুখে সময় কাটাতে লাগলেন। এদের একজন আমি, রসায়ন বিভাগের সামান্য লেকচারার। আমি কেন উল্টা গীত গাইলাম তা নিজেও জানি না। বহুদলীয় গণতন্ত্র, একদলীয় গণতন্ত্র বিষয়গুলি নিয়ে কখনো চিন্তা করি নি। আমার প্রধান এবং একমাত্র চিন্তা লেখালেখি। তিনটি উপন্যাস বের হয়ে গেছে। চতুর্থ উপন্যাস 'অচিনপুর' রাত জেগে লিখছি। আমাকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক আলী নওয়াব। ছাত্রাবস্থায় তাকে যমের মতো ভয় পেতাম। শিক্ষক হয়ে সেই ভয় কাটে নি, বরং বেড়েছে। ছাত্রাবস্থায় অনেকের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা যেত। এখন তা সম্ভব না। তার সঙ্গেই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল ক্লাস নেই। আমাকে সারাক্ষণ তার নজরদারিতে থাকতে হয়।

দুপুরের দিকে নওয়াব স্যারের আলসারের ব্যথা ওঠে। তাঁর মেজাজ তুঙ্গে অবস্থান করে। আমি তুঙ্গস্পর্শী মেজাজের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার বললেন, বসো। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে না। চেয়ার টেনে বসবে। তুমি এখন আমার ছাত্র না, কলিগ।

আমি বসলাম। স্যার বললেন, দুঃখজনক হলেও একটা সত্যি কথা শোনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা হলেন অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্রোতের সঙ্গে থাকতে হয়। কী বলছি বুঝতে পারছ?

আমি বললাম, পারছি।

যাও জাফরের সঙ্গে দেখা করো। সে যা বলবে সেইভাবে কাজ করবে।

আমি বললাম, স্যার। অবশ্যই।

অধ্যাপক জাফর মাহমুদ আমার সরাসরি শিক্ষক। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। ডিগ্রির সঙ্গে ব্রাইটনদের কিছু স্বভাবও নিয়ে এসেছেন। সারাক্ষণ সঙ্গে ছাতা রাখেন। রিকশায় যখন ওঠেন, রিকশার হুড ফেলে ছাতা মেলে বসে থাকেন।

এই মেধাবী অধ্যাপক মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তিনি বিড়ালপ্রেমিক। তাঁর ঘরভর্তি বিড়াল। এর মধ্যে একটি বিড়াল অন্ধ। বিড়ালটি তার অসম্ভব প্রিয়। নিজের শোবার বিছানা তিনি এই অন্ধ বিড়ালের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

জাফর স্যার সম্পর্কে একটি গল্প আগে বলে নেই। এতে মানুষটি সম্পর্কে সবাই কিছু ধারণা পাবেন। তাঁর গাড়ি নেই, সবসময় রিকশায় চলাচল করেন। একদিন তিনি রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেন রিকশাওয়ালার সিটে রক্তের দাগ। স্যার বললেন, এখানে রক্ত কেন?

রিকশাওয়ালা জানাল, কিছুদিন আগে তার পাইলসের অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার পনের দিন রিকশা চালাতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তার সংসার অচল বলে বাধ্য হয়ে রিকশা নিয়ে বের হয়েছে।

স্যার সেদিনই বেতন তুলেছেন। বেতনের পুরো টাকাটা রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকায় সংসার চালাবে। পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে রিকশা চালাবে না—এটা আমার অর্ডার।

যাই হোক, আমি জাফর স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। স্যার বললেন, তুমি এখনো পিএইচ.ডি করো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে হলে এই ডিগ্রি লাগবেই। তুমি যে

কাণ্ড করেছ, এতে সরকারের কাছে বৈরী হয়ে যেতে পার। তখন স্কলারশিপেরও সমস্যা হবে। আমার আদেশ, তুমি বাকশালের কাগজপত্রে সই করবে।

আমি বললাম, আপনার আদেশের বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বাকশালে যোগদানের কাগজে দস্তখত করার জন্যে রসায়ন বিভাগের অফিসে গেলাম। আমাকে জানানো হলো কাগজপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে চলে গেছে। রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে জানলাম সব কাগজপত্র ভাইস চ্যান্সেলরের বাসায় চলে গেছে। আগামীকাল ভোর সাতটা পর্যন্ত সময় আছে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসায় গিয়ে বাকশালে ভর্তি হওয়ার। আমি মনে মনে আনন্দিতই হলাম। স্যারকে বলতে পারব, চেষ্টা করেছিলাম।

আমরা তখন থাকি বাবর রোডের একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ির একতলায়। সরকার শহীদ পরিবার হিসেবে আমার মাকে সেখানে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই নিয়েও লঙ্কাকাণ্ড। এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি—এই বাড়ি তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে থাকবেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তারা মায়ের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলল। এরপর শুরু হলো তাণ্ডব। লেপ-তোষক, বইপত্র, রান্নার হাঁড়িকুড়ি তারা রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার ওপর রাইফেল তাক করে বলল, এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বের হন, নয়তো গুলি করব। মা বললেন, গুলি করতে চাইলে গুলি করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?

আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল তখন মায়ের হাত ধরে তাকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তায় নর্দমার পাশে অভুক্ত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন সুবেদার মেজর ওই বাড়ির একতলায় দাখিল হলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়লেন।

একটি শহীদ পরিবারকে অপমানের হাত থেকে রক্ষার জন্যে দুজন মহৎপ্রাণ মানুষ এগিয়ে এলেন। একজনের নাম আহমদ ছফা। তিনি ঘোষণা দিলেন, বঙ্গভবনের সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তিনি আত্মাহুতি দেবেন। তিনি এক টিন কেরোসিন কিনে আনলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছেন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সমকালের সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর।

দুজনের চেষ্টায় ওই বাড়ির দোতলায় দুই মাস পরে আমরা উঠলাম। একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবেদার। তিনি কঠিন বৈরীভাব ধরলেন।

আমাদের বাড়ির ছাদটা ছিল আমার খুব পছন্দের। সন্ধ্যার পর ছাদে হাঁটতাম। পাটি পেতে শুয়ে থাকতাম। আকাশের তারা দেখতাম।

রক্ষীবাহিনীর সুবেদার সাহেব একদিন ঘোষণা করলেন, এই বাড়ির ছাদ তার দখলে। আমরা কেউ ছাদে যেতে পারব না। আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। আমার ছাদ-ভ্রমণ বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, তার পানির নল সব ভাঙা ছিল। পাইপে করে একতলা থেকে পানি আনার ব্যবস্থা ছিল। সেটাও নির্ভর করত সুবেদার সাহেবের মর্জির ওপর। কোনো কোনো দিন তিনি পানির সাপ্লাই বন্ধ করে দিতেন। আমাদের পানি ছাড়াই চলতে হতো। স্নান বন্ধ।

আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে পরিত্যক্ত বিশাল এক তিনতলা বাড়িতে দলবল নিয়ে থাকতেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। রক্ষীবাহিনী আমাদের রাস্তায় বের করে দেওয়ার পর সাহায্যের আশায় আমি তার কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মহাবিপদে মানুষ খড়কুটো ধরে, আমি বঙ্গবীরকে ধরতে গিয়ে দেখি তিনি খড়কুটোর মতোই।

সেই সময় ঢাকা শহরে গুজবের অন্ত ছিল না। একটা প্রধান গুজব হলো— সরকারের নিমূল বাহিনী কাজ করছে। সন্দেহভাজন যুবক ছেলেদের ধরে ধরে নিয়ে যায়, তারপর আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই গুজবের কিছু সত্যতা থাকতেও পারে।

সেই সময় নিজেকে নিয়ে আমি খুব ভীত ছিলাম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমার মনে হতো, এই বুঝি দরজায় কড়া নড়বে। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। শেখ কামালের নামে ভয়ঙ্কর সব গুজব কিংবা রটনা প্রচলিত ছিল। এর একটি ব্যাংক-ডাকাতি বিষয়ক। আমি এই গুজব তখনো বিশ্বাস করি নি, এখনো করি না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে বাড়তি অর্থের জন্যে ডাকাতি করার প্রয়োজন পড়ে না। দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেই সময় নিজ দেশে আমাকে মনে হতো পরবাসী। দেশটাকে বুঝতেও পারছিলাম না। মনে

হচ্ছিল দেশের এনট্রপি শুধুই বাড়ছে। থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র—এন্ট্রপি হলো বিশৃঙ্খলার মাপ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে ঠিকঠাক করে তুলতে সবাই সাহায্য করবে। এটাই আশা করা হয়, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে তখন অস্বাভাবিকের রাজত্ব। সব দল বর্ষার কই মাছের মতো উজিয়ে গেছে। মাঠে নেমেছে সর্বহারা দল। যেহেতু তারা সর্বহারা, তাদের আর কিছু হারাবার নেই। তারা নেমেছে শ্রেণীশত্রু খতমে। তাদের প্রধান শত্রু আওয়ামী লীগ। পত্রিকার পাতা উল্টালেই সর্বহারার হাতে নিহত আওয়ামী লীগ নেতাদের ছবি পাওয়া যায়। সর্বহারা দলের প্রধান সিরাজ সিকদার। তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সর্বহারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেমেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। তারা বাংলাদেশকে বদলে দেবে। বাংলাদেশ হবে সমাজতান্ত্রিক দেশ। বিশেষ ধরনের এই সমাজতন্ত্র কায়েম শ্রেণীশত্রু খতম দিয়ে শুরু করতে হয়। চলছে হত্যাকাণ্ড।

গোকুলে বাড়ছে রক্ষীবাহিনী। সাভারে তাদের বিশাল ক্যাম্প। ট্রেনিংয়ে আছেন ভারতীয় মেজর রেডিড। রক্ষীবাহিনীর পোশাকও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো জলপাই রঙের। এই বাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং পেতেন ভারতের দেরাদুন ব্যাটল স্কুল থেকে। রক্ষীবাহিনীর ফরমেশন সাইন' ছিল বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত তর্জনি। এ থেকে মনে করা স্বাভাবিক, বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যই ছিল এই বাহিনীর মূলমন্ত্র। এটা স্বাভাবিকও ছিল, কারণ রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যই ছিল প্রাক্তন মুজিব এবং কাদের বাহিনীর সদস্য।

আমি কচ্ছপস্বভাবের মানুষ। ঝামেলার আঁচ পেলে খোলসের ভেতর ঢুকে বসে থাকতে পছন্দ করি। খোলসের ভেতর আবদ্ধ থেকে দেশের সে সময়কার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

আমার পক্ষে করা কঠিন। তারপরেও মনে হয়, রক্ষীবাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর প্রতিপক্ষ। এই বাহিনী এমনভাবে সাজানো ছিল যে, অতি দ্রুত তাদের সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়া করানো যায়।

যখন সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিল তখন রক্ষীবাহিনীর টিকির দেখাও পাওয়া গেল না। অল্পকিছু সেনাসদস্যের বিদ্রোহ দমন তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। বরং তারা উল্টোটাই করল। সাভারে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে তখন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ। রক্ষীবাহিনী তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে কী করতে হবে জানতে চেয়ে বারবার বিদ্রোহীদের কাছে খবর পাঠাতে লাগল। ভাবটা এরকম যে, আমরা ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। ইঙ্গিত পেলেই বিদ্রোহী সরকার যা করতে বলবে করব। বান্দা হাজির।

রাজনীতির কচকচানি থাকুক, নিজের কথা বলি। আমি তখন চরম অর্থনৈতিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমার বেতন এবং বাবার পেনশনের সামান্য (দুইশত) টাকা গোটা পরিবারের সম্বল। মাসের শেষের দিকে মা বের হন ধার করতে। মার পরিচিতজনরা তাঁকে দেখলেই আতঙ্কিত বোধ করেন।

গোদের ওপরে ক্যানসারের মতো অপ্রয়োজনীয় মেহমান আমাদের বসার ঘর আলো করে বসে থাকেন। এদের একজন কাইয়ুম ভাই। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাজশাহী বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিলেন। ঢাকায় পড়তে এসে তার ব্রেইনে গিটু লেগে গেল। পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি ইসলামি লেবাস গায়ে তুলে নিলেন। দাড়ি রাখলেন। চোখে সুরমা দেওয়া শুরু করলেন। ধর্মের প্রতি প্রবল আসক্তি যে-কোনো বয়সেই আসতে পারে। এটা দূষণীয় না। দূষণীয় হলো—তার মা-বাবা ঢাকায় থাকেন।

কাইয়ুম ভাই নিজের বাসা ছেড়ে ভোরবেলা আমাদের বাবর রোডের বাসায় চলে আসতেন। নাস্তা খেতেন, দুপুরের খাবার খেতেন, রাতের ডিনার শেষ করে নিজের বাসায় যেতেন। পরদিন ভোরে আবার উপস্থিত। খেতে বসে প্রায় সময়ই বলতেন, খাবারের মান আরেকটু উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাসায় রাতে রুটি খাওয়া হতো। শুকনো রুটি কাইয়ুম ভাইয়ের গলা দিয়ে নামে না বিধায় তার জন্যে ভাত রাঁধা হতো।

দ্বিতীয় যে মেহমান ড্রয়িংরুমে মাঝে মাঝে এসে বসে থাকত, তার সঙ্গে আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি। সুদর্শন রূপবান যুবক। সবসময় ইংরেজিতে কথা বলত বলে কলেজে তার নাম ছিল ইংলিশম্যান'। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তার পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি শুরু করেছি। আমার দায়িত্ব ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের স্লাইড রুমের ব্যবহার শেখানো। হঠাৎ দেখি ক্লাসে মাথা নিচু করে ইংলিশম্যান বসে আছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি ইংলিশম্যান না?

সে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, Yes sir.

আমি বললাম, তুমি আমাকে স্যার বলছ কেন? তুমি আমার বন্ধু।

সে বলল, Now you are my respected teacher.

তার কাছে শুনলাম অনেকদিন মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভুগে এখন সে সুস্থ হয়েছে। আবার পড়াশোনা শুরু করেছে।

আমি তাকে বাবর রোডের বাসায় নিয়ে গেলাম। তার জন্যে আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করছিলাম। তাকে বললাম, পড়াশোনায় সবরকম সাহায্য আমি করব। আমাকে স্যার ডেকে সে যেন লজ্জা না দেয়। আগে যেভাবে হুমায়ূন ডাকত এখনো তা-ই ডাকবে।

তিন থেকে চার মাস ক্লাস করার পর আবার সে পাগল হয়ে গেল। একদিন হতভম্ব হয়ে দেখি, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে। রসায়ন বিভাগের প্রতিটি রুমেই সে ঢুকে ব্যাকুল হয়ে বলছে, হুমায়ূন কোথায়? হুমায়ূন? My friend and my respected teacher হুমায়ূন?

সে শুধু রসায়ন বিভাগে না, বাবর রোডে আমার বাসাতেও হানা দিতে শুরু করল। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন সে আসবেই। একটি যুবক ছেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসার ঘরে সারা দিন বসে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

শুধু একজন বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নিতেন, তিনি কাইয়ুম ভাই। জাব্বা জোব্বা পরা মাওলানা, পাশে নগ্ন ইংলিশম্যান। কাইয়ুম ভাইয়ের ভাবভঙ্গি থেকে মনে হতো বিষয়টা স্বাভাবিক।

১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার। ইউনিভার্সিটিতে কোনো ক্লাস ছিল না। হেঁটে হেঁটে বাবর রোডের বাসায় এসেছি। অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা। আমি রোগাভোগা হওয়ার কারণে বাসে ঠেলাঠেলি করে কখনো উঠতে পারি না। রিকশা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বাসায় ঢুকে দেখি, কাইয়ুম ভাই এবং ইংলিশম্যান পাশাপাশি বসা। ইংলিশম্যান যথারীতি নগ্ন। কাইয়ুম ভাই বললেন, হুমায়ূন, তোমরা তরকারিতে বেশি ঝাল দাও। আমি এত ঝাল খেতে পারি না। তোমার মাকে আমার জন্যে কম ঝালের তরকারি রাঁধতে বলবে।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। একবার ভাবলাম বলি, অনেক যন্ত্রণা করেছেন। এখন আমাদের মুক্তি দিন। বলতে পারলাম না। যৌবনের শুরুতে আমি অনেক ভদ্র, অনেক বিনয়ী ছিলাম।

ইংলিশম্যান আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয় শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখিয়ে দাঁড়ানো। কাইয়ুম ভাইয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র সে গলা নামিয়ে বলল, হুমায়ূন, আমাকে একটা প্যান্ট দাও। কিছুক্ষণ আগে তোমার ছোটবোন শিখু উঁকি দিয়েছিল। তাকে দেখার পর থেকে লজ্জা লাগছে। একটা প্যান্ট দাও। প্যান্ট পরে চলে যাব।

আমার তখন দুটামাত্র প্যান্ট। একটা দিয়ে দেওয়া মানে সর্বনাশ। তারপরেও প্যান্ট এনে তাকে পরালাম। সে ইংরেজিতে বলল, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। আমার আর কেউ নেই। এইজন্যে তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি। গোপন খবর। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি। পুরোপুরি পাগল হলে গোপন খবর পাওয়া যায়। খবরটা হচ্ছে, আগামীকাল থেকে রক্তের নদী—River full of fresh blood. Blood blood and blood. কার রক্ত দিয়ে

শুরু হবে তা জানতে চাও? জানতে চাইলে তোমাকে বলব, আর কাউকে বলব না। মাছিকেও বলা যাবে না।

আমি বললাম, জানতে চাই না।

পাগল প্রলাপ বলবে তা-ই স্বাভাবিক। পাগলের কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

ইংলিশম্যান গলা নিচু করে বলল, হুমায়ূন, সাবধানে থাকবে।

আচ্ছা থাকব।

দরজা জানালা বন্ধ করে খাটের নিচে শুয়ে থাকবে।

আমি বললাম, আচ্ছা থাকব।

ইংলিশম্যান প্যান্ট পরে ঘর থকে বের হলো। আমাদের বাসা পার হওয়ার পর পর প্যান্ট খুলে ছুড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু নিল কয়েকটা কুকুর। তারা ঘেউ ঘেউ করছে, ইংলিশম্যানকে কামড়ানোর ভঙ্গি করছে। ইংলিশম্যান ফিরেও তাকাচ্ছে না। পাগলরা কুকুর ভয় পায় না—তা জানতাম না। প্রথম জানলাম।

৯. ১৫ আগস্ট, শুক্রবার

১৫ আগস্ট। শুক্রবার। মেজর ফারুকের জন্মবার। তার জন্মের পরপরই ফজরের আজান হয়েছিল। কাজেই এই দিনটি তার জন্যে শুভ। তারচেয়ে বড় কথা, আন্ধা হাফেজ সিগন্যাল পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। এখন ফারুক ইচ্ছা করলে তার কার্য সমাধা করতে পারেন। আন্ধা হাফেজ তাঁর মঙ্গলের জন্যে একটি তাবিজও পাঠিয়েছেন, তাবিজ ফারুকের কাছে পৌঁছানো যায় নি। আল্লাহপাকের একটি বিশেষ নামও তিনি ফারুককে জানিয়েছেন। সারাক্ষণ এই নাম জপলে ফারুক থাকবে বিপদমুক্ত। নামটা হলো—ইয়া মুয়াখখরু। এর অর্থ-হে পরিবর্তনকারী'।

ফারুকের স্ত্রী ফরিদা কোরানশরিফ নিয়ে জায়নামাজে বসেছেন। শুভ সংবাদ (?) না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোরান পাঠ করেই যাবেন।

ফজরের আজান হচ্ছে। মেজর ফারুকের ট্যাংকবহর বের হয়েছে।

১০. হরিদাসের চুল কাটার দোকান

হরিদাসের চুল কাটার দোকান সোবাহানবাগে। তার দোকানের একটু সামনেই ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের মাথা। সঙ্গতকারণেই হরিদাস তার সেলুনে সাইনবোর্ড টানিয়ে রেখেছে–

শেখের বাড়ি যেই পথে
আমার সেলুন সেই পথে।

সাইনবোর্ডের লেখা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে হরিদাস পথচারীদের জন্যে এই সাইনবোর্ড টানায় নি। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো একদিন এই সাইনবোর্ড বঙ্গবন্ধুর নজরে আসবে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসবেন। গম্ভীর গলায় বলবেন, সেলুনের সাইনবোর্ডে কী সব ছাতা-মাথা লিখেছিস! নাম কী তোর? দে আমার চুল কেটে দে। চুল কাটার পর মাথা মালিশ।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এ ধরনের কথা বলা মোটেই অস্বাভাবিক না, বরং স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি এমন আচরণ করেন বলেই তাঁর টাইটেল 'বঙ্গবন্ধু'।

হরিদাস চুল কাটার ফাঁকে ফাঁকে খদ্দের বুঝে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প ফাঁদে। খদ্দেররা বেশিরভাগই তার কথা বিশ্বাস করে। হরিদাস কাঁচি চালাতে চালাতে বলে, আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। যে কেঁচি দিয়া আপনের চুল কাটতেছি সেই কেঁচি দিয়া স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর চুল কেটেছি। তাও একবার না, তিন বার। প্রথমবারের ঘটনাটা বলি, চৈত্র মাসের এগার তারিখ। সময় আনুমানিক এগারটা...

পনেরই আগস্ট শেষরাতে হরিদাস তার দোকানে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, মড়মড় শব্দ হচ্ছে—দোকান ভেঙে পড়ছে। হরিদাস ভূমিকম্প হচ্ছে ভেবে দৌড়ে দোকান থেকে বের হয়ে হতভম্ব। এটা আবার কী?

আলিশান এক ট্যাংক তার দোকানের সামনে ঘুরছে। ট্যাংকের ধাক্কায় তার দোকান ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। ট্যাংকের ঢাকনা খোলা। দুজন কালো পোশাকের মানুষ দেখা যাচ্ছে। দোকান ভেঙে ফেলার জন্যে কঠিন কিছু কথা হরিদাসের মাথায় এসেছিল। সে কোনো কথা বলার আগেই ট্যাংকের পেছনের ধাক্কায় পুরো দোকান তার মাথায় পড়ে গেল। পনেরই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটল হরিদাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

ঢাকা মসজিদের শহর। সব মসজিদেই ফজরের আজান হয়। শহরের দিন শুরু হয় মধুর আজানের ধ্বনিতে। আজান হচ্ছে। আজানের ধ্বনির সঙ্গে নিতান্তই বেমানান কিছু কথা বঙ্গবন্ধুকে বলছে এক মেজর, তার নাম মহিউদ্দিন। এই মেজরের হাতে স্টেনগান। শেখ মুজিবের হাতে পাইপ। তার পরনে সাদা পাঞ্জাবি এবং ধূসর চেক লুঙ্গি।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কী চাও? মেজর ব্রিত ভঙ্গিতে আমতাআমতা করতে লাগল। শেখ মুজিবের কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেখ মুজিব আবার বললেন, তোমরা চাও কী?

মেজর মহিউদ্দিন বলল, স্যার, একটু আসুন।

কোথায় আসব?

মেজর আবারও আমতা-আমতা করে বলল, স্যার, একটু আসুন।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে কাজ করতে পারে নি, সে কাজ তোমরা করবে?

এই সময় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে ছুটে এল মেজর নূর। শেখ মুজিব তার দিকে ফিরে তাকানোর আগেই সে ব্রাশফায়ার করল। সময় ভোর পাঁচটা চল্লিশ। বঙ্গপিতা মহামানব শেখ মুজিব সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন। তখনো বঙ্গবন্ধুর হাতে তাঁর প্রিয় পাইপ।

বত্রিশ নম্বরের বাড়িটিতে কিছুক্ষণের জন্যে নরকের দরজা খুলে গেল। একের পর এক রক্তভেজা মানুষ মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী রমা আদালতে যে জবানবন্দি দেন তা তুলে দেওয়া হলো :

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাজের ছেলে আবদুর রহমান শেখ
ওরফে রমার জবানবন্দি

আমি ১৯৬৯ সালে কাজের লোক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর ৫টায় বঙ্গবন্ধু নিহত হন। তখন আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে থাকতাম। ওইদিন অর্থাৎ ঘটনার দিন রাত্রে আমি এবং সেলিম দোতলায় বঙ্গবন্ধুর বেডরুমের সামনে বারান্দায়

ঘুমিয়েছিলাম। আনুমানিক ভোর ৫টার দিকে হঠাৎ বেগম মুজিব দরজা খুলে বাইরে আসেন এবং বলেন যে, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। ওইদিন তিনতলায় শেখ কামাল এবং তার স্ত্রী সুলতানা ঘুমিয়েছিল। ওইদিন শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী এবং ভাই শেখ নাসের দোতলায় ঘুমিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও তার স্ত্রী এবং শেখ রাসেল দোতলায় একই রুমে ঘুমিয়েছিল। নিচতলায় পিএ মহিতুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মচারী ছিল।

বেগম মুজিবের কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি লেকের পাড়ে যেয়ে দেখি কিছু আর্মি গুলি করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। তখন আমি আবার বাসায় ঢুকি এবং দেখি পি.এ./রিসিপশন রুমে বঙ্গবন্ধু তার সাথে কথা বলিতেছে। আমি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এসে দেখি বেগম মুজিব দোতলায় ছোটাছুটি করছে। আমি সাথে সাথে তিনতলায় যাই এবং আমাদের বাসা আর্মিরা আক্রমণ করেছে বলে কামাল ভাইকে উঠাই। কামাল ভাই তাড়াতাড়ি একটা প্যান্ট ও শার্ট পরে নিচের দিকে যায়। আমি তার স্ত্রী সুলতানাকে নিয়ে দোতলায় আসি। দোতলায় গিয়ে একইভাবে আমাদের বাসা আর্মিরা আক্রমণ করেছে বলে জামাল ভাইকে উঠাই। তিনি তাড়াতাড়ি প্যান্ট, শার্ট পরে তার মার রুমে যান। সাথে তাঁর স্ত্রীও যান। এই সময়ও খুব গোলাগুলি হচ্ছিল। একপর্যায়ে কামাল ভাইয়ের আর্তচিঙ্কার শুনতে পাই। একই সময় বঙ্গবন্ধু দোতলায় আসিয়া রুমে ঢুকেন এবং দরজা বন্ধ করে দেন। প্রচণ্ড গোলাগুলি একসময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে আবার বাইরে এলে আর্মিরা তার বেডরুমের সামনে চারপাশে তাহাকে ঘিরে ফেলে। আমি আর্মিদের পিছনে ছিলাম। আর্মিদের লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, “তোরা কি চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?” তারা বঙ্গবন্ধুকে তখন সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ির ২/৩ ধাপ নামার পরে নিচের দিক হতে অনেক আর্মি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। গুলি খেয়ে

সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়েন। আমি তখন আর্মিদের পিছনে ছিলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি করো?" উত্তরে আমি বলি, "কাজ করি।" তখন তারা আমাকে ভিতরে যেতে বলে। আমি বেগম মুজিবের রুমের বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নিই। সেখানে বেগম মুজিবকে বলি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করেছে। ওই বাথরুমে শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের এবং আমি আশ্রয় নিই। শেখ নাসের ওই বাথরুমে আসার আগে তাঁর হাতে গুলি লাগে, তার হাত হতে তখন রক্ত ঝরছে। বেগম মুজিব শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে তার রক্ত মুছেন। এর পর আর্মিরা আবার দোতলায় আসে এবং দরজা পিটাতে থাকলে বেগম মুজিব দরজা খুলিতে যান এবং বলেন, "মরলে সবাই একই সাথে মরব।" এই বলে বেগম মুজিব দরজা খুললে আর্মিরা রুমের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং শেখ নাসের, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব এবং আমাকে নিচের দিকে নিয়ে আসছিল। তখন সিঁড়িতে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখে বলেন, "আমি যাব না, আমাকে এখানেই মেরে ফেলল।" এই কথার পর আর্মিরা তাকে দোতলায় তার রুমের দিকে নিয়ে যায়। একটু পরেই ওই রুমে গুলির শব্দসহ মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতে পাই। আর্মিরা নাসের, রাসেল ও আমাকে নিচতলায় এনে লাইনে দাঁড় করায়। সেখানে সাদা পোশাকের একজন পুলিশের লাশ দেখি। নিচে নাসেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে", তিনি শেখ নাসের বলে পরিচয় দিলে তাহাকে নিচতলায় বাথরুমে নিয়ে যায়। একটু পরেই গুলির শব্দ ও তার মাগো' বলে আর্তচিৎকার শুনতে পাই। শেখ রাসেল "মার কাছে যাব" বলে তখন কান্নাকাটি করছিল এবং পি.এ মহিতুল ইসলামকে ধরে বলছিল, "ভাই, আমাকে মারবে না তো?" এমন সময় একজন আর্মি তাহাকে বলল, "চলো তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই।" এই বলে তাহাকে দোতলায় নিয়ে যায়। একটু পরেই কয়েকটি গুলির শব্দ ও আর্তচিৎকার শুনতে পাই।

লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় সেলিমের হাতে এবং পেটে দুইটি গুলির জখম দেখলাম। এর পর দেখলাম কালো পোশাক পরিহিত আর্মিরা আমাদের বাসার সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ডিএসপি নূরুল ইসলাম এবং পিএ/রিসিপশনিস্ট মহিতুল ইসলামকে আহত দেখি। এর পরে আমাদের বাসার সামনে একটা ট্যাংক আসে। ট্যাংক হতে কয়েকজন আর্মি নেমে ভিতরের আর্মিদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কে আছে, উত্তরে ভিতরের আর্মিরা বলে, All are finished.' অনুমান বেলা ১২টার দিকে আমাকে ছেড়ে দিবার পর আমি প্রাণভয়ে আমার গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়া চলে যাই।

স্বাক্ষর
আবদুর রহমান শেখ (রমা)

মন্ত্রী সেরনিয়াবত (বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি) এবং শেখ মণি-র (বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে) বাড়িও একই সঙ্গে আক্রান্ত হলো। সেখানেও রক্তগঙ্গা। শেখ মণি মারা গেলেন তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে। পিতামাতার মৃত্যুদৃশ্য শিশু তাপস দেখল খাটের নিচে বসে। এই শিশুটি তখন কী ভাবছিল? কেবিনেট মন্ত্রী সেরনিয়াবত মারা গেলেন তার দশ-পনের বছরের দুই কন্যা, এগার বছর বয়সী এক পুত্র এবং মাত্র পাঁচ বছর। বয়সী এক নাতির সঙ্গে।

কাদের মোল্লা রোজ ফজরের নামাজ আদায় করে তার চায়ের দোকান খোলে। আজও তা-ই করেছে। কেরোসিনের চুলা ধরিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়েছে, তখনই সামরিক পোশাক

পরা একজন দৌড়ে এসে কাদের মোল্লার দোকানের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রক্তে তাঁর পোশাক ভেজা। তিনি পেটের কাছে কী যেন ধরে আছেন।

হতভম্ব কাদের মোল্লা ভীত গলায় বলল, আপনি কে?

সেনা কর্মকর্তা ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রীকে এই জিনিসটা পৌঁছে দিতে পারবে? তোমাকে তার জন্যে দুই হাজার টাকা দিব। আমার মানিব্যাগে দুই হাজার টাকা আছে।

কাদের মোল্লা বলল, অবশ্যই পারব। জিনিসটা কী?

সেনা কর্মকর্তা তার উত্তর দিতে পারলেন না। তার মুখ থেকে সাঁ সাঁ আওয়াজ বের হতে লাগল। এই সেনা কর্মকর্তা আমাদের পরিচিত। তিনি মেজর ফারুকের ঘনিষ্ঠজন, সুবেদার মেজর ইশতিয়াক। তিনি পেটের কাছে যে জিনিসটা ধরে আছেন তা হলো—বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে চুরি করে আনা চল্লিশ ভরি সোনার নৌকা। নিচে লেখা—'আদমজি শ্রমিক লীগের উপহার।

কাদের মোল্লা সোনার নৌকা ও মানিব্যাগ নিয়ে সেই দিনই দেশের পথে রওনা হলো।

আনন্দ ও উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে। বাইরে থেকে দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মুখ হা করা। সে মুখ দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। তার হাতে চটের ব্যাগ। এই ব্যাগে সোনার নৌকা ও মানিব্যাগ। চটের ব্যাগ কোথাও রেখে কাদের মোল্লা শান্তি পাচ্ছে না। একবার কোলে রাখছে, একবার বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে।

বাসে কাদেরের ডানপাশে বসা যাত্রী বলল, আপনার ব্যাগে কী?

কাদের মোল্লা চোখ গরম করে বলল, আমার ব্যাগে কী তা দিয়া আপনার প্রয়োজন কী?

রাগেন কী জন্যে? ব্যাগ নিয়া চাপাচাপি করতেছেন এইজন্যে জিগাইলাম।

কাদের মোল্লা বলল, চুপ। ঘুষি দিয়া নাকশা ফাটাইয়া দিব।

ঘুষি দিয়া দেখেন।

কাদের মোল্লা প্রচণ্ড ঘুষি দিয়ে সহযাত্রীর নাক ফাটিয়ে ব্যাগ নিয়ে চলন্ত বাস থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

সকাল সাতটা।

বাংলাদেশ বেতার ঘনঘন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে। উল্লসিত গলায় একজন বলছে, 'আমি ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ল' জারি করা হলো।'

দেশ থমকে দাঁড়িয়েছে।

কী হচ্ছে কেউ জানে না। কী হতে যাচ্ছে, তাও কেউ জানে না।

মানুষের আত্মার মতো দেশেরও আত্মা থাকে। কিছু সময়ের জন্যে বাংলাদেশের আত্মা দেশ ছেড়ে গেল।

মেজর জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর শুনে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, প্রেসিডেন্ট নিহত, তাতে কী হয়েছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে। কনস্টিটিউশন যেন ঠিক থাকে।

বঙ্গবন্ধুর অতি কাছের মানুষ তাঁর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ বসে আছেন রক্ষীবাহিনীর সদরদপ্তর সাভারে। আতঙ্কে তিনি অস্থির। রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করায় তাকে নিয়ে পড়েছে। তারা বারবার জানতে চাচ্ছে, তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে কী করবে? বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনী ঝিম ধরে বসে আছে। একসময়ের সাহসী তেজি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদও ঝিম ধরে আছেন। শুরু হয়েছে ঝিম ধরার সময়।

রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল আনন্দ মিছিল।

শফিক বাংলামোটর গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সেখানে রাখা ট্যাংকের কামানে ফুলের মালা পরানো। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাংকের ওপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।

আমার বাবর রোডের বাসার কথা বলি। বেতারে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবেদার পালিয়ে গেলেন। তাঁর দুই মেয়ে (একজন গর্ভবতী) ছুটে এল মা'র কাছে। তাদের আশ্রয় দিতে হবে। মা বললেন, তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে

কেন? তোমরা কী করেছ? তারা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, খালাম্মা, এখন পাবলিক আমাদের মেরে ফেলবে।

এই ছোট্ট ঘটনা থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার এবং তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণাও টের পাওয়া যায়।

খন্দকার মোশতাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও ফজরের নামাজটা সময়মতো পড়তে পারেন না। তিনি অনেক রাত জাগেন বলেই এত ভোরে উঠতে পারেন না। ফজরের ওয়াক্তের নামাজ নিয়ে তিনি চিন্তিতও না। নবি-এ-করিম (দঃ) একদিন ফজরের নামাজ সময়মতো পড়তে পারেন নি। এই কারণেই সবার জন্যে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত নমনীয় করা হয়েছে। কেউ দেরি করে পড়লেও তাতে দোষ ধরা হবে না।

পনেরই আগস্ট তার ঘুম ভাঙল আটটায়। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন—এই খবর তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। খবর নিয়ে এসেছে তাঁর ভাইস্তা মোফাজ্জল। তাকে ভীত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে। মোফাজ্জল বলল, রেডিও ছাড়ব? খবর শুনবেন?

মোশতাক বললেন, না। কড়া করে এক কাপ চা আনো। চা খাব।

মোফাজ্জল বলল, আপনি কি বাড়িতেই থাকবেন, না পালিয়ে যাবেন?

পালিয়ে যাব কোন দুঃখে? আমি অপরাধ কী করেছি?

সদর দরজায় কি তালা লাগায়া রাখব?

না। সদর দরজা থাকবে খোলা। তুমি নিজে সেখানে টুল পেতে বসে থাকবে। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে চাইলে তাকে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কে আসবে দেখা করতে?

মোশতাক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে কিছু সময় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা দরকার। বাথরুম হলো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে আদর্শ স্থান।

তিনি অজু করে বাথরুম থেকে বের হলেন। ফজরের নামাজ আদায় করলেন। আল্লাহপাকের কাছে নিজের নিরাপত্তা চেয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ শেষ করে নেয়ামুল কোরআন নিয়ে বসলেন। আল্লাহপাকের নিরান্নব্বই নাম পাঠ করে আজকের দিন শুরু করবেন।

ইয়া আল্লাহু (হে আল্লাহ)

ইয়া রহমানু (হে করুণাময়)

ইয়া রাহিমু (হে পরম দয়ালু)

ইয়া মালেকু (হে প্রভু)

ইয়া কুদ্দুসু (হে পবিত্রতম)

ইয়া সালামু (হে শান্তি দানকারী)

'ইয়া সালামু' পড়ার পরপরই বিকট ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যেতে লাগল। মোশতাক তার তিনতলার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালেন। তার কলিজা শুকিয়ে গেল। বিকটদর্শন এক ট্যাংক তার বাড়ির সামনে। ট্যাংকের কামান তার শোবারঘরের দিকে তাক করা। ঘটনা কী? ট্যাংক কেন? এত দিন যা শুনে এসেছেন তার সবই কি ভুয়া? ট্যাংকের গোলার আঘাতে তাকে মরতে হবে? ট্যাংক কোনো শান্তির পতাকাবাহী যুদ্ধযান না। অকারণে কেউ নিশ্চয়ই তার বাড়ির সামনে ট্যাংক বসাবে না।

সিঁড়িতে বুটজুতার শব্দ হচ্ছে। খন্দকার মোশতাক একমনে দোয়ায়ে ইউনুস পড়তে লাগলেন। এই দোয়া পাঠ করে ইউনুস নবি মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তার বিপদ ইউনুস নবির চেয়ে বেশি।

দরজা খুলে মেজর রশীদ ঢুকলেন। তার হাতে স্টেনগান। তার পেছনে দু'জন সৈনিক। তাদের হাতেও স্টেনগান। সৈনিক দু'জন স্টেনগান মোশতাকের দিকে তাক করে আছে।

মোশতাক নিশ্চিত মৃত্যু ভেবে আল্লাহপাকের কাছে তওবা করলেন। মেজর রশীদ বললেন, স্যার চলুন। মোশতাক বললেন, কোথায় যাব?

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। প্রথমে রেডিওস্টেশনে যাবেন। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

ট্যাংক এসেছে কেন?

প্রেসিডেন্টের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ট্যাংক এসেছে।

মোশতাক বললেন, শুক্রবারে আমি জুম্মার নামাজের আগে কোনো কাজকর্ম করি না। দায়িত্ব যদি গ্রহণ করতে হয় জুম্মার নামাজের পর।

মেজর রশীদ কঠিন গলায় বললেন, আপনাকে আমি নিতে এসেছি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। অর্থহীন কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।

মোশতাক বললেন, অবশ্যই অবশ্যই। তবে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আপনাকে কোনো সময় দেওয়া হবে না।

কাপড় চেঞ্জ করার সময় দিতে হবে। আমি নিশ্চয়ই লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিব না?

সকাল এগারটা পঁয়তাল্লিশে খন্দকার মোশতাক বেতারে ভাষণ দিলেন। তিনি আবেগমথিত গলায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সূর্যসন্তান' আখ্যা দিলেন।

মোশতাকের ভাষণের পর বঙ্গভবনে আনন্দ উল্লাস, কোলাকুলি, একে অন্যকে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে গেল। শুরু হলো মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি কেউ নিজে খাচ্ছে না। একজন অন্যজনকে খাইয়ে দিচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ তখনো তাঁর বত্রিশ নম্বর বাড়িতে পড়ে আছে।

সন্ধ্যাবেলা শফিক এসেছে রাধানাথ বাবুর কাছে। শফিকের বিপর্যস্ত ভঙ্গি দেখে তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। শফিক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, আর কেউ প্রতিবাদ করল না! কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াল না!

রাধানাথ বললেন, কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায় নি এটা ঠিক না। খবর পেয়েছি ব্রিগেডিয়ার জামিলউদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন। গুলি খেয়ে মারা গেছেন। পুলিশের কিছু কর্মকর্তা বাধা দিয়েছিলেন। তারাও মারা গেছেন।

শফিক বলল, কেউ তাঁর পক্ষে রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলবে না?

রাধানাথ বললেন, তুমি কি রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলেছ? তুমি যেহেতু বলো নি, অন্যদের দোষ দিতে পারবে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

জি।

রাধানাথ বললেন, সাহস আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলার—মুজিব হত্যার বিচার চাই?

শফিক বলল, আমার সাহস নেই। আমি খুবই ভীতু মানুষ। কিন্তু আমি বলব।

কবে বলবে?

আজ রাতেই বলব।

রাত আটটা। মনে হচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তিন বাহিনীপ্রধান নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। পুরোনো মন্ত্রিসভার প্রায় সবাইকে নিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যুক্ত হয়েছেন। আতাউল গনি ওসমানি হয়েছেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

মনে হচ্ছে পুরোনো আওয়ামী লীগই আছে, শুধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। আপসহীন জননেতা মওলানা ভাসানী, যিনি একমাস আগেও বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, তিনিও নতুন সরকারকে সমর্থন জানালেন।

পনেরই আগস্ট রাত ন'টার দিকে সরফরাজ খানের বাড়ির সামনের রাস্তায় এক যুবককে চিৎকার করতে করতে সড়কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যেতে দেখা গেল।

সে চিৎকার করে বলছিল–মুজিব হত্যার বিচার চাই। যুবকের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল ভয়ঙ্করদর্শন একটি কালো কুকুর।

সেই রাতে অনেকেই রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ির জানালা খুলে যুবককে আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধও করে ফেলছিল।

আচমকা এক আর্মির গাড়ি যুবকের সামনে এসে ব্রেক কষল। গাড়ির ভেতর থেকে কেউ-একজন যুবকের মুখে টর্চ ফেলল। টর্চ সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ইংরেজিতে বলল, Young man, go home. Try to have some sleep.

শফিককে এই উপদেশ যিনি দিলেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

যান যান বাসায় যান।

শফিক বলল, জি স্যার। যাচ্ছি।

খালেদ মোশাররফ বললেন, আমি আপনাকে চিনি। অবন্তিদের বাসায় দেখেছি। আপনি অবন্তির গৃহশিক্ষক।

জি।

গাড়িতে উঠুন। আপনি কোথায় থাকেন বলুন। আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

আমি হেঁটে যেতে পারব। তা ছাড়া আমার সঙ্গে এই কুকুরটা আছে। কুকুর নিয়ে আপনার গাড়িতে উঠব না।

শফিক চলে যাচ্ছে। জিপ দাঁড়িয়ে আছে। খালেদ মোশাররফ সিগারেট ধরিয়ে অবন্তির গৃহশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

শফিক বলল, স্যার যাই? স্লামালিকুম।

খালেদ মোশাররফ বললেন, আপনি একজন সাহসী যুবক। আসুন আমার সঙ্গে হাত মেলান। সাহসী মানুষদের হাতের চামড়া থাকে মোলায়েম। আপনার হাতের চামড়া দেখি?

খালেদ মোশাররফ অনেকক্ষণ শফিকের হাত ধরে রইলেন। শফিকের হাতের চামড়া মোলায়েম না, কঠিন।

রাত বারোটার কিছু পরে চাদরে নাকমুখ ঢেকে ছানু ভাই উপস্থিত হলেন পীর হাফেজ জাহাঙ্গীরের হুজরাখানায়।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের রাতের ইবাদত শেষ হয়েছে। তিনি ঘুমুতে যাচ্ছিলেন। ছানু ভাইকে দেখে এগিয়ে এলেন।

ছানু বললেন, পীর ভাই। রাতে থাকার জায়গা দেওয়া লাগে। বিপদে আছি।

কী বিপদ?

বঙ্গবন্ধু নাই। আমরা যারা তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ তারাও নাই। বাংলাদেশের পাবলিক হলো, ব্রেইন ডিফেক্ট পাবলিক। যে-কোনো একজন যদি বলে—ধরো, ছানুরে ধরো। পাবলিক দৌড় দিয়া আমারে ধরবে।

আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি। রাতের খনা কি খেয়েছেন?

রাতের খানা কখন খাব বলেন! দৌড়ের উপর আছি। খানার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। আরেকটা কথা—সরফরাজ খান সাহেব কি আছেন।

আছেন।

ভালো হয়েছে, উনাকে তার বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়ে দিব। খান সাহেবকে আমি বড়ভাইয়ের মতো দেখি, শ্রদ্ধা করি।

সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ লিগেসি অব ব্লাড-এ উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরপর টুঙ্গিপাড়ায় তার পৈতৃক বাড়িতে স্থানীয় জনগণ হামলা করে এবং বাড়ির সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।(১)

হায়রে বাংলাদেশ!

-----

১. এন্থনি মাসকারেনহাস তার গ্রন্থে সত্যের মতো করে অনেক মিথ্যাও ঢুকিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ি লুট হওয়ার ঘটনা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

১১. সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার দিন

সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার দিন থেকে পনের দিন—

১৫ আগস্ট – বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত। খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগ্রহণ। দেশে সামরিক আইন জারি। বিগত সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী পুনর্বহাল। বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি পাকিস্তানের সমর্থন। (মনে হয় পাকিস্তান তৈরি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি।)

১৬ আগস্ট – বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সৌদি আরবের স্বীকৃতি। (সৌদি সরকারও তৈরি, কত তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দেওয়া যায়। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের দাফন সম্পন্ন। (পুরো একদিন বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ পড়ে রইল। কেউ জানে না, মৃতদেহ কী করা হবে।)

২৩ আগস্ট – সামরিক আইনের অধীনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলি, তাজউদ্দিন আহমদসহ ২০ জন গ্রেফতার।

২৪ আগস্ট – মেজর জেনারেল শফিউল্লার জায়গায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নতুন সামরিক বাহিনী প্রধান।

২৭ আগস্ট – ভারতের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দান। (ভারতের ওপর অনেক ভরসা ছিল। বাংলাদেশ তাদের সঙ্গে পঁচিশ বছরের মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ। তারাও যেন পাগল হয়ে গেল কত দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়া যায়।)

৩১ আগস্ট – মহাচীনের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান। (স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে গণচীনের অনেক দিন লেগেছিল। এইবার আর লাগল না।)

সেলুকাস। কী বিচিত্র এই দেশ! এমন এক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

ভুল বললাম, শফিকের মতো অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিবাদ করেছে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলেন। মুজিববিহীন বাংলাদেশে তিনি বাস করবেন না। ভারতে তিনি কাদেরিয়া বাহিনী তৈরি করে সীমান্তে বাংলাদেশের থানা আক্রমণ করে নিরীহ পুলিশ মারতে লাগলেন। পুলিশ বেচারারা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে জড়িত না, বরং সবার আগে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার জন্যে তারা প্রাণ দিয়েছে।

শেখ হাসিনার গৃহশিক্ষক অভিনেতা আবুল খায়ের দেশ ছেড়ে আমেরিকা চলে গেলেন।

কবি নির্মলেন্দু গুণের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তিনি বারহাট্টায় নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। তখন তার মনে হতো বঙ্গবন্ধুর আত্মা তার ভেতর ঢুকে গেছে। এই খবর সবাই পেয়ে গেছে। সবাই হন্যে হয়ে কবিকে হত্যা করার জন্যে খুঁজছে। কবিকে হত্যা করলেই বঙ্গবন্ধুর আত্মা কব্জা করা যাবে।

নির্মলেন্দু গুণ সেই দুঃসহ সময়ের বর্ণনা দিয়ে সুন্দর একটি গ্রন্থ (রক্তঝরা নভেম্বর **১৯৭৫**, বিভাস প্রকাশনা) রচনা করেছেন। কৌতুহলী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

১২. তারিখ ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫ সন

তারিখ ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫ সন। রাধানাথ বাবু মেঝেতে শীতলপাটির বিছানায় শুয়ে আছেন। তার পাশে শফিক কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে। রাধানাথ বাবু জরুরি এক চিঠির ডিকটেশন দেবেন। চিঠি যাবে খন্দকার মোশতাকের হাতে।

রাধানাথ বললেন, শচীনকর্তা মারা গেছেন, এই খবর জানো?

না।

উনি আজ মারা গেছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা শচীনকর্তার মৃত্যুতে যতটা শোক পেয়েছে, তার এক শ ভাগের এক ভাগ শোকও তাদের জাতির পিতার মৃত্যুতে পায় নি।

শফিক বলল, খন্দকার মোশতাক হয়তো তাকে জাতির পিতার আসন থেকে নামিয়ে দেবেন।

রাধানাথ বললেন, এটা উনি পারবেন না। সবার ক্ষমতারই সীমাবদ্ধতা আছে। খন্দকার মোশতাক তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানেন।

শফিক হতাশ গলায় বলল, জানলেই ভালো।

রাধানাথ বললেন, লেখো–

মাননীয় প্রেসিডেন্ট। খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। লিখেছ?

জি।

এখন লেখো–

নমস্কার এবং অভিনন্দন। আশা করি আপনার মাধ্যমে দেশ দিকনির্দেশনা পাবে। আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আপনি যেন কারাগারে বন্দি আওয়ামী লীগের নেতাদের নিরাপত্তার বিষয়টি খেয়ালে রাখেন। বাংলাদেশের এখন যে অবস্থা যে-কোনো দুর্ঘটনা যে-কোনো সময় ঘটে যাবে। একটি আপ্তবাক্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— 'সবাইকে তার মুদ্রায় হিসাব দিতে হবে।'

বিনীত
রাধানাথ

শফিক বলল, খন্দকার মোশতাক সাহেব আপনাকে চেনেন?

খুব ভালোমতো চেনেন। এই চিঠি নিয়ে তুমি যাবে, সরাসরি তাঁর হাতে দিবে।

আমি বঙ্গভবনে ঢুকব কীভাবে?

সেই ব্যবস্থা আমি করব। এখন দোতলার স্টোররুমে যাও। একটা রেকর্ডপ্লেয়ার আছে। সেটা আনন। শচীনকর্তার 76 RPM এর বেশ কিছু রেকর্ড আছে। যে-কোনো একটা নিয়ে আসো। তার গান শুনে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাই। শফিক! আমার মন বলছে একটা সময় আসবে যখন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনে এ দেশের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। আমি সেই দিন দেখে যেতে চাই।

রাধানাথ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। রেকর্ডপ্লেয়ারে শচীনকর্তার গান বাজছে।

রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলারে
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলারে।
কই গেলারে বন্ধু, কই রইলারে
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলারে।।

বঙ্গভবনে ঢুকতে এবং খন্দকার মোশতাকের হাতে চিঠি দিতে শফিকের মোটেই বেগ পেতে হলো না। মোশতাক মুখবন্ধ খাম হাতে নিলেন। চিঠি বের করে পড়লেন না। ভুরু কুঁচকে শফিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কড়া গলায় বললেন, তোমার নাম কী?

শফিক ভীত গলায় বলল, শফিক।

তুমি রাধানাথ বাবুকে চেনো কীভাবে?

আমি উনার কিছু টুকটাক কাজ করে দেই।

টুকটাক কাজ মানে কী?

ডিকটেশন নেই। উনার চোখ ভালো না। লেখাপড়া করতে সমস্যা হয়।

আমার কাছে যে চিঠি এসেছে তার ডিকটেশন তুমি নিয়েছ?

জি।

চিঠির বিষয়বস্তু তুমি জানো?

জি।

রাধানাথ বাবুকে আমার শুভেচ্ছা দেবে এবং বলবে, তিনি যদি বঙ্গভবনে এসে আমার সঙ্গে এক কাপ চা খান, তাহলে আমি খুশি হব।

জি বলব। স্যার, আমি কি এখন যেতে পারি?

খন্দকার মোশতাক বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাকে কেউ আটকে রাখে নি।

প্রেসিডেন্ট শফিককে আটকান নি, কিন্তু একজন আটকালেন। তার নাম মেজর রশীদ। ইনি তখন বঙ্গভবনে বিশাল এক রুম দখল করে থাকেন। তার রুমের সামনে স্টেনগান হাতে দুজন সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা এই ঘরেই হয়।

শফিককে মেজর রশীদের সামনে উপস্থিত করা হলো। মেজর শীতল গলায় বললেন, Who are you?

স্যার, আমার নাম শফিক।

তুমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছ। উনার সঙ্গে দেখা করার পাস আমি ইস্যু করি। তুমি পাস কোথায় পেলে?

শফিক ভীত গলায় বলল, পাস কোথা থেকে এসেছে আমি জানি না স্যার। প্রেসিডেন্ট সাহেব ব্যবস্থা করেছেন।

উনার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?

আমার কোনো প্রয়োজন নেই স্যার। আমি সামান্য ব্যক্তি। আমি উনার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম।

চিঠি কে দিয়েছেন?

রাধানাথ বাবু।

Who is he?

তিনি একজন প্রেসের মালিক। প্রেসের নাম 'আদর্শলিপি'।

চিঠিতে কী লেখা?

শফিক ইতস্তত করে বলল, চিঠিতে কী লেখা আমি জানি না স্যার।

শফিক এই মিথ্যা বলে ঘাবড়ে গেল। তার মনে হচ্ছে এই লোক তার মিথ্যা ধরে ফেলেছে।

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? শফিক বলল, স্যার, আমি ভীতু মানুষ। এইজন্যে ভয় পাচ্ছি।

মেজর রশীদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ আছে বলে তুমি ভয় পাচ্ছ।

মেজর সাহেব নিচু গলায় তার পাশে সিভিল পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে কী যেন নির্দেশ দিলেন।

তাঁর নির্দেশমতো শফিককে নিয়ে যাওয়া হলো রমনা থানায়। সেখানে পুলিশের এসপি সালাম সাহেবের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হলো।

সালাম সাহেব হতাশ গলায় বললেন, যারা আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁদের হাতে বন্দিশালা নেই। সন্দেহভাজনদের তারা থানায় পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে দুর্ভাগ্যবানরা চলে যান আনিতে।

শফিক বলল, আনি কী?

আনি হচ্ছে আগাছা নিমূল। আপনি যদি আগাছা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে নির্মূল করা হবে। কাজটা আমরা করব না—এই ভরসা আপনাকে দিতে পারি। আপনার সান্ত্বনা বলতে এইটুকু।

শফিক বলল, স্যার, আমি কি আমার অবস্থা জানিয়ে কাউকে টেলিফোন করতে পারি?

পারেন, তবে থানার টেলিফোন এখন নষ্ট। যান, হাজতে অপেক্ষা করুন। টেলিফোন ঠিক হলে আপনাকে খবর দেওয়া হবে।

সারা দিনেও টেলিফোন ঠিক হলো না। শফিক ঠিক করল, কোনো কারণে যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আর ঢাকায় থাকবে না। মা'র কাছে চলে যাবে।

রাত আটটায় হাজতের দরজা খুলে তাকে বের করা হলো। মিলিটারি একটা জিপ থানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এসপি সালাম সাহেবের সঙ্গে একজন অফিসার। এই অফিসারকে শফিক বঙ্গভবনে দেখে নি।

অফিসার এসেছেন সিভিল পোশাকে। সালাম সাহেব তাকে ক্যাপ্টেন সাহেব' বলে ডাকছেন বলেই শফিক নিশ্চিত হলো ইনি একজন ক্যাপ্টেন। এই সময়ে মেজর এবং ক্যাপ্টেনরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শফিকের ইচ্ছা করছে ক্যাপ্টেন সাহেবের পা চেপে ধরতে। জীবন রক্ষার জন্যে শুধু পা চেপে ধরা না, পা চাটাও যায়।

ক্যাপ্টেন সাহেব কড়া গলায় বললেন, আপনি বোস্টার সাহেবকে চেনেন?

শফিক বলল, জি-না স্যার। উনি কে?

উনি বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। আপনি তাঁকে চেনেন না, তারপরেও উনি কেন আপনার মুক্তির জন্যে সুপারিশ করলেন?

তাও আমি জানি না। আমি অতি তুচ্ছ একজন। আমার জন্যে সুপারিশ করার কেউ নেই স্যার।

ক্যাপ্টেন বললেন, যান চলে যান। You are released. আপনি চাইলে আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।

শফিক বলল, স্যার, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমি নিজে যেতে পারব।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, এইজন্যে বললাম।

শফিক বলল, বৃষ্টিতে ভিজে আমার অভ্যাস আছে স্যার।

১৩. অবন্তির কাছে লেখা ইসাবেলার চিঠি

অবন্তির কাছে লেখা ইসাবেলার নভেম্বর মাসের চিঠি–

আমার ছোট্ট পাখি

আমার জেসমিন পুষ্প,

এই মেয়ে, তোমার নভেম্বর মাসের চিঠি আমি লিখছি অক্টোবরের একুশ তারিখে। তোমার দেশের যে অবস্থা চিঠি পেতে পেতে নভেম্বর চলে আসবে।

তোমার জন্যে অতি আনন্দের একটা খবর দিয়ে শুরু করি। তোমার বাবা ফিরে এসেছে। প্রথমে তাকে চিনতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল স্ট্রিটবেগার। ভিক্ষা চাইতে দরজার বেল টিপছে। আমি তাকে বললাম, Go to hell. সে যথারীতি তার পুরনো অভ্যাসমতো রসিকতা করল। সে বলল, Hell-এ যাওয়ার জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি। তোমার চেয়ে কঠিন Hell আর কোথায় পাব?

তোমার বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। নানান অসুখবিসুখ বাঁধিয়েছে। মাথার চুল বেশির ভাগ পড়ে গেছে। চোখ রক্তবর্ণ, কোটরে ঢুকে গেছে। কিডনি মনে হয় ঠিকমতো কাজ করছে না। পায়ে পানি এসেছে। লিভারও মদ খেয়ে পচিয়ে ফেলেছে। তার সারা শরীর হলুদ। গা থেকে টক টক গন্ধও বের হচ্ছে।

আমি তাকে বললাম, আমার কাছে কেন এসেছ? আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি তোমার মেয়ের কাছে ফিরে যাও। সে বলল, এই অবস্থায় মেয়ের কাছে ফেরা যাবে না। শরীর সারিয়ে তারপর যাব। তুমি আমার শরীর সারাবার ব্যবস্থা করো।

আমি বললাম, আমি কেন তোমার শরীর সারাবার ব্যবস্থা করব? তুমি কে?

সে বলল, আমি তোমার কেউ না তা ঠিক আছে, কিন্তু আমি তোমার অতি আদরের কন্যার বাবা। এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট না?

আমি বললাম, না। আমার বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে। তুমি তোমার থাকার জায়গা খুঁজে বের করো। আমি তোমার জন্যে অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গিয়েছি। আর যাব না।

সে বলল, Ok, চলে যাচ্ছি। বলেই পুঁটলি-পাটলি নিয়ে আমার বাড়ির ঠিক সামনে পামগাছের নিচে বসল। আমি দেখেও না-দেখার ভান করলাম। দুপুরে দেখি সে পুঁটলি থেকে ভদকার বোতল বের করে পানি ছাড়া শুধু শুধু ভদকা খাচ্ছে। আমার দিকে বোতল উচিয়ে বলল, চিয়ার্স! আনন্দময় পুরোনো দিনের স্মরণে। ইসাবেলা, দ্য গ্রেট ড্যানসিং কুইন।

এখন তুমি বলো, এই মানুষের ওপর কতক্ষণ রাগ করে থাকা যায়? আমি তার জন্যে গেস্টরুম খুলে দিয়েছি। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। চিকিৎসায় চট করে কোনো সুফল পাওয়া যাবে এ রকম মিথ্যা আশায় বসে থাকবে না। তবে আমি তোমার বাবার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করব না। যিশুখ্রিষ্টের শপথ।

আমি তোমাকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিজনেস ক্লাসের একটি টিকিট পাঠাব। খোজখবর করছি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ঢাকায় যায় কি না। তুমি দ্রুত চলে এসো। আমি আড়াল থেকে পিতা-কন্যার মিলনদৃশ্য দেখতে চাচ্ছি।

ইতি
তোমার মা ইসাবেলা

পুনশ্চ-১ : তোমার বাবা তোমাকে চিঠি লেখার জন্যে কাগজকলম নিয়েছে। চিঠি লিখে শেষ করেছে কি না জানি না, শেষ করামাত্র চিঠি তোমাকে পাঠাব।

পুনশ্চ-২ তোমার বাবা এতদিন কোথায় ছিল শুনলে বড় ধরনের চমক খাবে। সে ছিল জেলে। তার দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কী অপরাধে তা এখনো জানি না। এ বিষয়ে সে মুখ খুলছে না।

পুনশ্চ-৩ তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম, এই মানুষটার মতো ঘৃণা আমি আর কাউকে করি না। এখন মনে হচ্ছে, এই ধারণা ভুল। তোমার বাবাকে আগে যতটা ভালোবাসতাম, এখন ততটাই ভালোবাসি। কিংবা কে জানে, হয়তো তারচেয়ে বেশি।

পুনশ্চ-৪: খুব জরুরি একটা কথা লিখতে চাচ্ছিলাম। এখন মনে পড়ছে না। ইদানীং আমার এই সমস্যা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কথা মনে থাকে। প্রয়োজনীয় কথা মনে থাকে না।

অবন্তি মায়ের চিঠি পরপর তিনবার পড়ল। কিছুক্ষণ চিঠি গালে ধরে রাখল। চিঠি থেকে চা পাতা এবং লেবুর সতেজ গন্ধ আসছে। মা নিশ্চয়ই নতুন ধরনের কোনো পারফিউম চিঠিতে মাখিয়ে দিয়েছে। অবন্তি চিঠি হাতে দাদাজানের ঘরে। ঢুকল। সরফরাজ খান আতকে উঠে বললেন, তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? is anything wrong?

অবন্তি বলল, কী রকম দেখাচ্ছে?

মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে ভূত দেখেছিস। মুখ রক্তশূন্য।

আমার চোখে মুখে কোনো আনন্দ দেখতে পাচ্ছ না?

না।

না দেখতে পেলে বুঝতে হবে তোমার অবজারভেশান পাওয়ার অতি দুর্বল। যাই হোক, তুমি তো আমার সব চিঠিই আগে সেন্সর করে আমাকে দাও। মার এইবারের চিঠিটা কি পড়েছ?

না।

এই নাও চিঠি। পড়লে আনন্দ পাবে। বাবার খোঁজ পাওয়া গেছে। বাবা এখন মা'র সঙ্গেই আছে। মা'র বাড়ির সামনে একটা পামগাছের নিচে আস্তানা গেড়েছে। নানান কর্মকাণ্ড করে মা'কে ভোলানোর চেষ্টা করছে। মা অবশ্যি কঠিন চিজ। ভুলছে না। বারান্দার সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে বাবাকে দেখতে না হয়।

সরফরাজ খান বললেন, হড়বড় করে এইসব কী বলছিস? চিঠি দে পড়ে দেখি।

অবন্তি বলল, চিঠি এখনই পড়া শুরু করবে না। আগে আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি আজ রাতে একটা পার্টি দেব। আমার আনন্দ আমি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।

অন্যেরা মানে কারা?

খালেদ চাচা, আমার স্যার, শামীম শিকদার। তুমি বড় দেখে একটা পাঙ্গাস মাছ কিনবে, বাবার পছন্দের মাছ। কই মাছ আর মটরশুটি কিনবে। খালেদ চাচু মটরশুটি দিয়ে কই মাছ পছন্দ করেন। আজ রাতে হবে মাছ উৎসব।

তুই তো মাছ খাস না।

এখন খাই। খতিবনগরের হাফেজ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাতল মাছের পেটি খেয়ে মাছ খাওয়া ধরেছি।

সরফরাজ খান বিরক্ত গলায় বললেন, আবার তার কথা কেন? আমি চাই না এই বাড়িতে তার নাম উচ্চারিত হোক।

অবন্তি হাসতে হাসতে বলল, হাফেজ সাহেব ঢাকায় থাকলে তাকেও দাওয়াত দিতাম।

সরফরাজ খান বললেন, তোর বাবার কাণ্ডকারখানা আমি কোনোদিন বুঝি নি। তোর কাণ্ডকারখানাও বুঝি না। আমার একটা সাজেশান শোন, শফিক আর ওই যে শামীম, এদের আসতে বলার কিছু নেই। এরা কোনোভাবেই আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত না।

অবন্তি বলল, আমার পার্টিতে কে আসবে, কে আসবে না, তা আমি ঠিক করব। তুমি না।

সরফরাজ খান বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, চোখ মুখ কঠিন করে ফেলতে হবে না।

অবন্তি বলল, চোখ মুখ কঠিন করেছি অন্য কারণে। হঠাৎ মনে পড়ল, শফিক স্যার অনেক দিন এ বাড়িতে আসেন না। তুমি কি তাকে আসতে নিষেধ করেছ?

সরফরাজ খান জবাব দিলেন না।

অবন্তি বলল, তোমার কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের জন্যে আমি তোমাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি। আজকের পার্টিতে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি না।

তার মানে?

তার মানে আজ তোমার জন্যে খাবার আসবে হোটেল থেকে। তুমি হাসছ কেন? আমি সিরিয়াস। ভালো কথা, শফিক স্যারের ঠিকানা লিখে দাও। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে দাওয়াত দিয়ে আসব।

তোকে যেতে হবে না। মাস্টার আশপাশেই থাকে। মোড়ের এক চায়ের দোকানে থাকে। চা বানিয়ে বিক্রি করে।

অবন্তি বলল, বাহ্, ইন্টারেস্টিং তো!

সরফরাজ খান ভুরু কুঁচকালেন। ঘটনাটা কেন ইন্টারেস্টিং বুঝতে পারলেন না।

রমনা থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শফিক তার নিজের ভাড়া বাসায় ফিরে যায় নি। রাধানাথ বাবুর সঙ্গেও দেখা করে নি। শফিক নিশ্চিত, এই মানুষ অতি বিপজ্জনক। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের শফিকের মতো অভাজনকে সুপারিশ করার পেছনে এই মানুষটার হাত আছে। এঁরা অনেক বড় মানুষ। বড় মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। বড়র পীরিত বালির বাধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাদ।

সে কাদেরের চায়ের দোকানে এসে উঠেছে। এখন সে এখানেই রাতে ঘুমায়। গোসল সারে ধানমণ্ডি লেকে। বাথরুমের জন্যে এক দারোয়ানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। তাকে কাদের মোল্লা মাসে কুড়ি টাকা করে দেয়।

চায়ের দোকানের মূল মালিক কাদের মোল্লা দোকানের দায়িত্ব শফিকের কাছে দিয়ে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

শফিক সুখেই আছে। সারা দিন চা বানায়, রাতে দোকান বন্ধ করে দোকানের ভেতর ঘুমায়। কালাপাহাড় তাকে পাহারা দেয়। কিছুক্ষণ পর পর দোকানের চারপাশে ঘুরপাক খায়। আশেপাশে কেউ না থাকলে শফিক কালাপাহাড়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। কালাপাহাড় ঘেউ ঘেউ করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। তাদের আলোচনার নমুনা–

কিরে কালাপাহাড়, আছিস কেমন?

ঘেউ।

আমি যে আন্ডারগ্রাউন্ডে আছি বুঝতে পারছিস? কেউ আমার খোঁজ জানে। রাধানাথ বাবু না, অবন্তিও না। অবন্তিকে চিনিস?

ঘেউ ঘেউ।

নে একটা বিস্কুট খা। একটু পর ভাত বসাব, তখন ভাত খাবি। আজ কী রান্না হবে জানতে চাস?

ঘেউ।

আজকে বিরাট আয়োজন। গরম ভাত, বেগুন ভাজা আর মাষকলাইয়ের ডাল। রাতে করব ডিমের সালুন।

শফিক কেরোসিনের চুলায় ভাত বসিয়েছে। দুপুরের দিকে চা-পিপাসুদের ভিড় তেমন থাকে না। শফিক তখন রান্না চড়ায়। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বই পড়ে। আজ পড়ছে বনফুলের একটা উপন্যাস, নাম জঙ্গম। উপন্যাসটা সে রাধানাথ বাবুর লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছে। শফিকের ধারণা এত সুন্দর উপন্যাস সে অনেকদিন পড়ে নি। মাত্র দশ পৃষ্ঠা বাকি আছে।

বইটা শেষ করে সে রাধানাথ বাবুকে ফেরত দেবে না। নিজের কাছে রেখে দেবে। বই নিজের কাছে রাখলে দোষ হয় না। এই বইটা অবন্তিকে পড়তে দিতে হবে।

চিনি কম দিয়ে আমাকে এক কাপ চা দিন তো।

শফিক হতভম্ব হয়ে তাকাল। কী আশ্চর্য, অবন্তি হাসিমুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুই সেকেন্ড আগেই সে অবন্তির কথা ভাবছিল। কাকতালীয় ঘটনা? নাকি অন্য কিছু?

অবন্তি বলল, আমি কিন্তু টাকা আনি নি। আমাকে বাকিতে চা খাওয়াতে হবে। বলতে বলতে কাস্টমারদের জন্যে রাখা কাঠের বেঞ্চিতে অবন্তি বসল। এখন সে পা নাচাচ্ছে।

শফিক বলল, কেমন আছ অবন্তি?

অবন্তি বলল, আমি ভালো আছি। এখন আপনি বলুন তো, আপনার পছন্দের মাছ কী?

আমার পছন্দের মাছ জেনে কী হবে!

অবন্তি বলল, কিছু হোক বা না-হোক আমি জানতে চাচ্ছি।

টেংরা মাছ।

অবন্তি বলল, টেংরা মাছ? এই মাছ কারও পছন্দের হতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না।

শফিক বলল, আমার মা বেগুন দিয়ে টেংরা মাছ রাধেন। তার সঙ্গে কিছু আমচুর দিয়ে দেন। টক টক লাগে। আমার কাছে মনে হয় বেহেশতি খাবার।

আপনার মা কি বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ।

আমি তার কাছে থেকে আমচুর দিয়ে টেংরা মাছের রেসিপি নিয়ে নেব। আপাতত আমচুর ছাড়াই আপনাকে টেংরা মাছ খেতে হবে। আজ রাতে আপনার টেংরা মাছ খাওয়ার নিমন্ত্রণ। কই, আমাকে চা দিচ্ছেন না কেন?

সত্যি চা খাবে?

হ্যাঁ খাব।

শফিক অবাক হয়ে ভাবছে, কী আশ্চর্য মেয়ে! সে একবারও জানতে চাইছে শফিক এখানে চা বানাচ্ছে কেন? যেন শফিকের জন্যে চা বানানোর কর্মকাণ্ডই স্বাভাবিক।

অবন্তি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, বাহ্ সুন্দর চা বানিয়েছেন! আপনি যদি পুরোপুরি চায়ের কারিগর হয়ে যান, তাহলে আমি রোজ এসে এক কাপ করে চা খেয়ে যাব। ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

দেখুন ভয়ংকর একটা কুকুর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি আমার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

শফিক বলল, ঝাঁপ দিবে না।

অবন্তি বলল, আপনি কী করে বুঝলেন যে ঝাঁপ দিবে না? কুকুরের মনের কথা কি আপনি জানেন?

সব কুকুরের মনের কথা জানি না। এটার মনের কথা জানি। এটা আমার কুকুর। এর নাম কালাপাহাড়।

অবন্তি হতভম্ব গলায় বলল, এর নাম কালাপাহাড়!

হ্যাঁ। আমি যেখানে যাই সে আমার পেছনে পেছনে যায়।

কী আশ্চর্য!

শফিক বলল, আশ্চর্য কেন?

অবন্তি বলল, এ রকম একটা ভয়ংকর কুকুর আপনার সঙ্গী, এইজন্যেই বললাম, কী আশ্চর্য।

অবন্তি অনেক রানাবানা করেছিল। সে তার দাদাজানের জন্যে সত্যি সত্যি হোটেল থেকেও খাবার আনিয়েছিল—ডাল গোশত। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তার পার্টিতে কেউ এল না।

খালেদ মোশাররফ এলেন না। তিনি কেন আসছেন না, তা জানালেনও না। এই ধরনের কাজ তিনি আগে কখনো করেন নি।

শামীম শিকদার দেশে নেই। সে নাকি কোন আর্মি অফিসারকে বিয়ে করে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

শফিককে সন্ধ্যাবেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। রাধানাথ বাবুকে কে বা কারা ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে। তার আদর্শলিপি প্রেসের অনেক কর্মচারীর মতো শফিকও একজন সাসপেক্ট।

রমনা থানার ওসির সঙ্গে শফিকের প্রাথমিক কথোপকথন—

আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলো।

জি স্যার।

রাধানাথ বাবু খুন হয়েছেন, এটা জানেন তো?

কিছুক্ষণ আগে জেনেছি।

এখন বলুন, রাধানাথ বাবুর গলায় ছুরিটা কি আপনি বসিয়েছেন, নাকি আপনার কোনো সঙ্গী? জবেহ করে কাউকে হত্যা একা করা যায় না। কয়েকজন লাগে। একজন ছুরি চালায়, বাকিরা ধরে থাকে। বুঝেছেন?

জি স্যার।

ভেরি গুড। এখন মুখ খুলুন।

শফিক মুখ খুলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

১৪. দুঃস্বপ্ন দেখে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ

দুঃস্বপ্ন দেখে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদের ঘুম ভাঙল। ভয়ে এবং উত্তেজনায় তার হাঁপানির মতো হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে ধাতস্ত করার চেষ্টা করলেন। নিজেকে সামলানো যাচ্ছে না। তার হাত পারকিনসন্স রোগীর মতো কাঁপছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ।

তাঁর স্বপ্ন খুব ভয়ংকর কিন্তু ছিল না। স্বপ্নটা বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। আতংকে অস্থির হওয়ার মতো কিছু না।

তিনি দেখেছেন তাঁর আগামসি লেনের বাড়ির ছাদে তিনি বসে আছেন। তাঁর সামনে একগাদা কবুতর। তিনি কবুতরকে চাল খাওয়াচ্ছেন। হঠাৎ চিলেকোঠার দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। শব্দে সব কবুতর উড়ে গেল। তিনি তাকিয়ে দেখেন ছাদের দরজা এবং দেয়াল ভেঙে প্রকাণ্ড এক ট্যাংক ঢুকেছে।

স্বপ্নে ছাদে ট্যাংক আসা খুবই স্বাভাবিক মনে হলো। ট্যাংকের ভেতর কর্নেল ফারুক বসে আছেন। ফারুকের চোখে কালো চশমা, গায়ে কিছু নেই, খালি গা। স্বপ্নে এই বিষয়টাও মোটেই অস্বাভাবিক মনে হলো না। কর্নেল ফারুক বললেন, কবুতরগুলি খুবই যন্ত্রণা করছে। দিন-রাত বাকবাকুম ডাক। আমি কবুতর মারতে এসেছি।

মোশতাক বললেন, উত্তম কাজ করেছেন। সব কবুতর মেরে ফেলা উচিত। কাকগুলি থাকুক। এরা ময়লা খেয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে। কবুতর কোনো কাজের পাখি না।

ছাদে আবারও ঘড়ঘড় শব্দ। আরেকটা ট্যাংক ঢুকছে। তার পেছনে আরেকটা, তার পেছনে আরেকটা। ট্যাংকগুলি নির্বিচারে কামান দাগতে শুরু করেছে।

খন্দকার মোশতাক যখন ট্যাংকের স্বপ্ন দেখছেন তখন কাকতালীয়ভাবে মেজর ফারুক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে আটটা ট্যাংক এনে বঙ্গভবনের চারদিকে বসাচ্ছিলেন। বঙ্গভবনে আগেই আটটা ট্যাংক ছিল, এখন হলো যোলটা। বঙ্গভবন পুরোপুরি সুরক্ষিত। ষোলটা ট্যাংক ডিঙিয়ে কেউ এখানে ঢুকবে না। সে যত বড় বীরপুরুষই হোক।

ফারুক আতংকে অস্থির হয়ে ছিলেন, কারণ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মমাশাররফের ভাবভঙ্গি মোটেই তার ভালো মনে হচ্ছিল না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কর্নেল শাফাত জামিল। বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকেও ট্রপস মুভমেন্ট শুরু হয়েছে।

খালেদ মোশাররফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল হুদাও যুক্ত হয়েছেন। কর্নেল হুদার ভাবভঙ্গিও ভালো না। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১০ এবং ১৫ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট আসছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদ মোশাররফের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

কোনো কারণে যদি খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবন আক্রমণ করেন তাহলে ভরসা ট্যাংকবহর।

ফারুকের আতংকগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ আন্ধা হাফেজ। আন্ধা হাফেজ খবর পাঠিয়েছেন—ফারুকের বাহিনী পনেরই আগস্টে বাড়াবাড়ি করেছে, তার ফল অশুভ হয়েছে। ফারুকের উচিত জীবন বাঁচানোর জন্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং কোনোদিন দেশে ফিরে না আসা।

নভেম্বরের দুই তারিখ ভোরে ফারুক ব্যাকুল হয়ে টেলিফোন করলেন কর্নেল ওসমানীকে। তিনি যেন খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলে একটা সমঝোতায় আসেন। এখন মোটামুটি পরিষ্কার, খালেদ মোশাররফ কিছু ঘটাতে যাচ্ছেন। সেনাকর্মকর্তারা সবাই কোনো-না-কোনো সময়ে বঙ্গভবনে এসেছেন। চা-পানি খেয়েছেন। মেজর ফারুক, মেজর রশীদ ও মেজর ডালিমের সঙ্গে গল্পগুজব করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম খালেদ মোশাররফ। তিনি কখনো আসেন নি।

কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে খালেদ মোশাররফের সংক্ষিপ্ত টেলিফোন কথোপকথন—

ওসমানী : খালেদ, এইসব কী হচ্ছে!

খালেদ : কিছুই হচ্ছে না স্যার। আপনি ট্যাংকগুলিকে ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দিন।

ওসমানী : আমি বঙ্গভবনে যাচ্ছি, তুমিও আসো। আমরা কথা বলি। মেজর রশীদ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

খালেদ মোশাররফ : আমার সঙ্গে কী কথা? খুনি মেজররা যারা দেশ শাসন করছে তাদের সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই।

ওসমানী : বঙ্গভবনে জোর গুজব, জিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। তুমি কি জিয়াকে হত্যা করেছ?

খালেদ মোশাররফ : আমি রক্তপাতে বিশ্বাস করি না। জিয়াকে আটক করা হয়েছে, হত্যা করা হয় নি। তবে বঙ্গভবনে ঢুকে একজনকে আমার হত্যা করার ইচ্ছা আছে। আপনি কি তার নাম শুনতে চান? তিনি প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক। শ্বেত সর্প।

ওসমানী : কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে যাবে না। [এই পর্যায়ে টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।]

বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট সাহেব জোহরের নামাজ শেষ করে, চোখ বন্ধ করে জায়নামাজে বসে আছেন। তিনি দরুদে তুনাজ্জিনা পাঠ করছেন। মানবজীবনের যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এই দোয়ার শক্তি সর্বজনস্বীকৃত।

মোশতাক সাহেবের একাগ্র মনোোযোগ ব্যাহত হলো। মেজর রশীদের গলা— আপনি দেখি বঙ্গভবনকে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছেন! সারাক্ষণ নামাজ কালাম পড়লে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করবেন কীভাবে?

মোশতাকের মুখে চলে এসেছিল বলবেন, রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্যে তো আপনারাই আছেন। তিনি শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। সবসময় সব কথা বলা যায় না।

আপনার নামাজ কি শেষ হয়েছে? আমি জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি।

জরুরি কাজটা কী?

আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা।

খন্দকার মোশতাক বললেন, আমার কিসের দুশ্চিন্তা? আমি কাউকে খুন করে ক্ষমতায় আসি নি। আমাকে জোর করে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে।

মেজর রশীদ কড়া গলায় বললেন, বুরবাকের মতো কথা বলবেন না। আপনি ক্ষমতায় বসার জন্যে জিভ বের করে বসে ছিলেন।

খন্দকার মোশতাক বললেন, বাহাসের প্রয়োজন নাই। কী বলতে চান বলুন।

সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানকে যে আটক করা হয়েছে, এটা জানেন?

জানি না। ডিজিএফআই আমাকে কোনো খবর দেয় না। তারা আমাকে ভাসুর জ্ঞান করে। ভাসুরকে সব কথা বলা যায় না।

মেজর রশীদ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, রসিকতা করবেন না। সময়টা রসিকতার জন্যে উপযুক্ত না।

খন্দকার মোশতাক বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

মেজর রশীদ বললেন, খালেদ মোশাররফ আমাদের ক্যান্টনমেন্টে নিজ নিজ রেজিমেন্টে ফিরে যেতে বলেছেন। এর অর্থ জানেন?

এর অর্থ হলো সব স্বাভাবিক। ঘরের পাখি ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া ধান খাইতে লাগিল।

আবার রসিকতা?

আলহামদুলিল্লাহ্। রসিকতা কেন করব? আপনি যেমন আমার শালা না, আমিও তেমন আপনার দুলাভাই না, যে, কথায় কথায় রসিকতা করব।

মেজর রশীদ হতাশ গলায় বললেন, রেজিমেন্টে ফিরে যাওয়া মানে সরাসরি কোর্টমার্শালে উপস্থিত হওয়া। খালেদ মোশাররফ হচ্ছে ময়মনসিংহের ছেলে। এদের ঘাড়ের তিনটা রগ থাকে তেড়া। তেড়াগের কারণে সে আমাদের গুলি করে মারবে। নামকাওয়াস্তে কোর্টমার্শাল হবে। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

খন্দকার সাহেব মনে মনে বললেন, ঘরের পাখি ঘরে ফিরিয়া ধানের বদলে গুলি খাইয়া মরিল।

মেজর রশীদ বললেন, আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা যেন ফিরে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে যাব। আওয়ামী লীগের সব নেতা শেষ করে দিয়ে যাব। বিশেষ করে যারা জেলে আছে তাদের। এদের খুঁজে বেড়াতে হবে না। সবাই

একসঙ্গেই আছে। নেতা নির্মূলে আপনার কি সমর্থন আছে?

খন্দকার মোশতাক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আছে, সমর্থন আছে। এই কাজটা করতে পারলে দেশের জন্যে বড় কাজ করা হবে। বাকশালের কবর হয়ে যাবে। দেশ চলতে শুরু করবে সোনার রথে।

মেজর রশীদ বললেন, কাজ শেষ করে বিদেশ চলে যাওয়া যায়। সময়সুযোগমতো আবার ফিরে আসা।

খন্দকার মোশতাক বললেন, অবশ্যই ফিরে আসবেন। আপনারা দেশের সূর্যসন্তান। আপনাদের ছাড়া দেশ চলবে কীভাবে? দেশে কেউ আপনাদের ছায়াও স্পর্শ করতে পারবে না। আমি ইনডেমনিটি বিলে সই করেছি, গ্যাজেটে তা প্রকাশিত হয়েছে।

আপনি কথা বেশি বলেন। কম কথা বলুন। পরিস্থিতি কোনদিকে যাচ্ছে তা খেয়াল করুন।

শফিককে থানাহাজত থেকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আসামিকে কোর্টে চালান দিলে তাকে আর থানায় ফেরত আনা যায় না। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তিন দিন ধরে শফিক জেলহাজতে আছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে

এখনো কেউ আসে নি। শফিক খবর পেয়েছে, পুলিশের এই জিজ্ঞাসাবাদ নাকি ভয়ংকর। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে মরা মানুষও নাকি উঠে বসে। সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে, আবার মৃতমানুষ হিসেবে মেঝেতে পড়ে যায়।

জেলহাজতে শফিকের পরিচয় হয়েছে বরিশালের আলিম ডাকাতের সঙ্গে। আলিম ডাকাত আটক হয়েছে—এক পরিবারে তিনজনকে হত্যার জন্যে। যে কোনো কারণেই হোক, আলিম ডাকাত শফিককে স্নেহের চোখে দেখছে। হাজতে তার জন্যে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেছে। একজন হাজতিকে নিযুক্ত করেছে শফিকের গা-হাত-পা মালিশ করার জন্যে।

শফিক বলেছিল, গা-হাত-পা মালিশের কোনো প্রয়োজন নেই। আলিম ডাকাত বলল, প্রয়োজন অবশ্যই আছে। পুলিশের মারের সময় যেন ব্যথা-বেদনা কম হয় এইজন্যেই শরীর তৈরি করা। পুলিশ যখন নিয়ে যাবে তখন দু'টা ট্যাবলেট দিব। একফাকে গিলে ফেলবেন। এরপর পুলিশ যদি মারতে মারতে হাড়ি ভেঙে ফেলে, ব্যথা-বেদনা হবে না। আরও টেকনিক আছে, সময়মতো সব শিখায়ে দিব।

আলিম ডাকাতের মাধ্যমে শফিক অবন্তিকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। আলিম বলেছে, চিঠি জায়গামতো পৌঁছে গেছে। শফিক জানে না পৌঁছেছে কি না।

অবন্তিকে লেখা শফিকের চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেখানে লেখা–

অবন্তি,

আমি জেলহাজতে আছি। রাধানাথ বাবু খুন হয়েছেন। পুলিশের হাস্যকর ধারণা, খুন আমি করেছি। তোমার দাদাজানকে বলে তোমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করা?

ইতি
শফিক

৩ নভেম্বর। রাত আড়াইটা। হঠাৎ জেলখানার পাগলাঘণ্টি বাজতে লাগল। শফিক পাগলাঘণ্টি শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। কারারক্ষীদের ছোটাছুটি দেখা যাচ্ছে। তারা কেউ কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। আলিম ডাকাত শফিকের চিন্তিত মুখ দেখে বলল, নিশ্চিন্তে ঘুমান। এরা পাগলাঘণ্টি বাজানোর প্র্যাকটিস করতেছে।

পাগলাঘণ্টি বাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন আইজি প্রিজন নুরুজ্জামান। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের জেলার আইজি প্রিজনকে খবর দিয়ে এনেছেন। সেনাবাহিনীর রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন অস্ত্র হাতে একদল সৈনিক নিয়ে এসেছে। তারা জেলখানায় ঢুকে কিছু দুষ্ট বন্দিকে শায়েস্তা করতে চায়। কী অদ্ভুত কথা!

আইজি প্রিজন হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলেন, রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন এবং তার লোকজনের ভাবভঙ্গি ভয়ংকর। জেল গেট না খুলে দিলে তারা এখানেই খুনখারাবি করবে।

তাঁর নিজের জীবন নিয়েই এখন সংশয়। তিনি প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাককে টেলিফোন করলেন। অবস্থা জানালেন।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক নির্বিকার গলায় বললেন, যারা ঢুকতে চাচ্ছে তাদের ঢুকতে দিন।

নুরুজ্জামান বললেন, স্যার, আপনি কী বলছেন?

খন্দকার মোশতাক ধমক দিয়ে বললেন, আমি কী বলেছি আপনি শুনেছেন। আপনি কানে ঠসা না।

স্যার, জেল গেট খুলে দিতে বলছেন?

মোশতাক জবাব না দিয়ে টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন।

মুসলেহ উদ্দিনের বন্দুকের মুখে আইজি প্রিজন দলবল নিয়ে এক নম্বর সেলে গেলেন। সেখানে তাজউদ্দীন এবং নজরুল ইসলাম ছিলেন। দুই নম্বর সেলে ছিলেন মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামান। এই দু'জনকে এক নম্বর সেলে আনা হলো। রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন খুব কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে চারজনকে হত্যা করে। তাজউদ্দীন ছাড়া বাকি তিনজন তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান। তাজউদ্দীনের হাঁটুতে ও পেটে গুলি লেগেছিল। তিনি পানি পানি' বলে কাতরাচ্ছিলেন। তাঁকে পানি দেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না।

মুসলেহ উদ্দিন চলে যাওয়ার পর আরেকটি ঘাতক দল আসে। এই দলের প্রধান নায়েক আলী। তাকে মৃত চার নেতাকে দেখানো হয়। নায়েক আলি মৃত শবের ওপরে বেয়োনেট চার্জ করে।

তিন নম্বর সেলে ছিলেন আওয়ামী লীগের আরেক নেতা। আব্দুস সামাদ আজাদ। ঘাতকেরা তাকে কিছুই বলে না। সবাই শেষ হলেও তিনি কেন টিকে থাকেন কে বলবে! রাজনীতির খেলা বোঝা বিচিত্র। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই খেলা 'বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।

জেলখানার পাগলাঘণ্টি বাজতেই থাকল। সব বন্দি তখন জেগে উঠেছে। তারা প্রচণ্ড হইচই করছে। দরজায় বাড়ি দিচ্ছে। তারা তখনো কী ঘটেছে জানে না। তবে কাতরানি ধ্বনি এবং পানির কাতর উচ্চারণ শুনছে।

শফিক এই উত্তেজনা সহ্য করতে পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এই রাত থেকেই তার এপিলেপসির শুরু। শফিক তার প্রতিটি এপিলেপটিক সিজারের আগে আগে কালাপাহাড়কে দেখত। কালাপাহাড় নাকি মানুষের মতো গলায় বলত—সাবধান, এখনই ঘটনা ঘটবে। শুয়ে পড়েন। দাঁতের ফাঁকে কিছু একটা রাখেন, না রাখলে জিহ্বা কেটে যাবে।

জেলহত্যা-বিষয়ে আইজি প্রিজনের জবানবন্দি তুলে দেওয়া হলো অধ্যায়ের শেষে। এই জবানবন্দি একুশ বছর পর উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কী কাণ্ড ঘটেছে কেউ তা জানে না। প্রেসিডেন্ট সাহেব জানেন এবং ডিজেএফআই প্রধান মেজর জেনারেল খলিল জানেন। এই দুজনের কেউই মুখ খুলছেন

না। প্রেসিডেন্ট আছেন বঙ্গভবনে। রাত চারটায় তিনি ঘুমুতে গেছেন। তখনো তিনি জানেন না বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত তিন শ' সৈন্যের পদাতিক দল নিয়ে মেজর ইকবাল বঙ্গভবন ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেছেন।

নভেম্বর মাসের হালকা শীতে প্রেসিডেন্ট সাহেবের ভালো ঘুম হচ্ছিল। ঘুম ভাঙল বিকট শব্দে। কী হচ্ছে কী হচ্ছে বলে তিনি জেগে উঠলেন। কী হচ্ছে কেউ বলতে পারল না। বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে বিকট শব্দে দুটি মিগ বিমান উড়ে গেল। এর মধ্যে একটি আবার ফিরে এসে বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে চক্কর খেতে লাগল। মিগ বিমানের সঙ্গে যুক্ত হলো দুটি হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার দুটির সঙ্গে আছে ট্যাংকবিধ্বংসী মিসাইল। প্রেসিডেন্ট মোশতাক আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।

তিনি কর্নেল ওসমানীকে টেলিফোন করে কাঁদো কাঁদো গলায় তক্ষুনি বঙ্গভবনে আসতে বললেন।

প্রেসিডেন্টের জন্যে সকালের নাশতা নিয়ে এসেছে। প্রেসিডেন্ট চায়ের কাপে বড় চুমুক দিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললেন। তিনি হা করে বসে আছেন। মুখের জ্বলুনি কমছে না। মাথার ওপর মিগ বিমান চক্কর দিচ্ছে। তারা কি বোমা বর্ষণ করবে? তিনি বোমার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন? কবর দেওয়ার মতো শরীরের কোনো অংশ কি অবশিষ্ট থাকবে? মনে হয় না।

রেডিও বাংলাদেশ নীরব। তার মানে বড় কিছু-একটা ঘটেছে। সেটা কী?

ওসমানী বঙ্গভবনে ঢোকার পর জানা গেল, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। খালেদের সঙ্গে আছেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সহচর ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিল। ক্যান্টনমেন্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন তাঁদের হাতে। এয়ার মার্শাল তোয়াব খালেদকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই আকাশে মিগ বিমান উড়ছে। শুধু যে ভয় দেখানোর জন্যে উড়ছে তা না। ফারুকের ট্যাংকবহরের ওপর বোমাবর্ষণের পরিকল্পনাও তার আছে।

খালেদ মোশাররফের নির্দেশে ৪৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যান্টি ট্যাংক কামান নিয়ে বঙ্গভবন ঘিরে ফেলল। পুরোপুরি যুদ্ধাবস্থা। একদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের বাহিনী, অন্যদিকে ফারুকের ট্যাংক ও আর্টিলারি বহর। দুই দলই মুখখামুখি বসা।

সেনাবাহিনী প্রধান জিয়া বন্দি। জিয়ার বাসভবন ঘিরে রাখা সৈন্যদলের প্রধান মেজর হাফিজকে জিয়া জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি বন্দি?

মেজর হাফিজ হাসলেন। এই হাসির অর্থ জেনারেল জিয়া বুঝতে পারলেন।

অজানা আশংকায় অস্থির হয়ে বেগম জিয়া টেলিফোন করলেন ওসমানীকে। তার একটাই অনুরোধ, জিয়াকে যেন নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কাছে খালেদ মোশাররফ তিনটি দাবি পাঠিয়েছেন। দাবিগুলো হচ্ছে—

১. সমস্ত ট্যাংক ও কামান ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আসবে। শহরে কিছুই থাকবে না।

২. বঙ্গভবনে বসে ফারুক-রশীদের দেশ চালানোর অবসান ঘটবে। তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চেইন অব কমান্ড মানতে হবে।

৩. জিয়া চিফ অব স্টাফ থাকতে পারবেন না।

মেজর ফারুক, মেজর রশীদ, ওসমানী এবং প্রেসিডেন্ট রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন। খালেদ মোশাররফের তিন দাবি নিয়ে আলোচনা চলছে।

ফারুক বললেন, আমি আমার ট্যাংক ও আর্টিলারি নিয়ে যুদ্ধ করব। ক্যান্টনমেন্টে আমার ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, যুদ্ধ করলে ব্যাঙা হয়ে যাবেন।

ফারুক চোখমুখ লাল করে বললেন, ব্যাঙা হয়ে যাব মানে কী?

ওপর থেকে যখন বোমা পড়বে তখন ব্যাঙের মতো চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন। একে বলে ব্যাঙা হয়ে যাওয়া।

ফারুক বললেন, জটিল সময়ে আপনার তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতা আমার খুবই অপছন্দ।

প্রেসিডেন্ট বললেন, রসিকতা বাদ। এখন একটা প্রস্তাব দেই? আপনাদের দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করি? আমার প্রস্তাব নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। মাথা গরম করবেন না। আপনারা দেশত্যাগ করবেন। আমিও দেশত্যাগ করব।

কর্নেল ওসমানী অবাক হয়ে বললেন, দেশত্যাগ করে আপনি কোথায় যাবেন?

প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি বঙ্গভবন ছেড়ে আগামসি লেনের নিজ বাড়িতে চলে যাব। এটাই আমার জন্যে দেশত্যাগ।

খালেদ মোশাররফ বিকাল তিনটায় জেলহত্যার খবর পেলেন। তিনি শীতল গলায় বললেন, একজীবনে অনেক রক্ত দেখেছি, আর রক্ত দেখতে চাই না, তবে খন্দকার মমাশতাকের বুকে আমি নিজ হাতে চারটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব। চার নেতার সৌজন্যে চার বুলেট। ফারুক রশীদ গং-এর অবসানও আমি ঘটাতে যাচ্ছি। প্রয়োজনে বঙ্গভবন আমি ধুলায় মিশিয়ে দেব।

খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনের উদ্দেশে নিজেই যুদ্ধযাত্রা করলেন। তখন সময় সন্ধ্যা সাতটা। একটু আগেই মাগরেবের আযান হয়েছে।

একই সময়ে তেজগা বিমান বন্দরে একটা বিমান ব্যাংককের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বিমানে আছেন মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদসহ ১৭জন সেনা

কর্মকর্তা এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। মহিলাদের অনেককেই নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে দেখা গেল।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বঙ্গভবনের গেট দিয়ে ঢোকার মুহূর্তে তেজগা বিমান বন্দর থেকে বিশেষ বিমান ব্যাংককের উদ্দেশে দেশ ছাড়ল।

আইজি প্রিজন নুরুজ্জামানের জেলহত্যা রিপোর্ট

১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর ভোের তিনটায় আমি বঙ্গভবন থেকে মেজর রশীদের একটা ফোন পাই। তিনি আমার কাছে জানতে চান, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কোনো সমস্যা আছে নাকি? আমি জানালাম, ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থা আমার জানা নেই।

এরপর তিনি আমাকে জানালেন কয়েকজন বন্দিকে জোর করে নিয়ে যেতে কিছু সেনাসদস্য জেল গেটে যেতে পারে। আমি যেন জেল গার্ডদের সতর্ক করে দেই। সেই অনুযায়ী আমি সেন্ট্রাল জেলে ফোন করি এবং জেলগেটে দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ডারকে ম্যাসেজটি জেলারকে পৌঁছে দিতে বলি, যাতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়।

৩/৪ মিনিট পর বঙ্গভবন থেকে আরেকজন আর্মি অফিসারের টেলিফোন পাই। তিনি জানতে চান আমি ইতিমধ্যেই জেল গার্ডদের সতর্ক করে দিয়েছি কি না। আমি ইতিবাচক জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে জেলগেটে চলে যেতে বলেন।

আমি তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ডিআইজি প্রিজনকে ফোন করি। খবরটা জানিয়ে আমি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে জেলগেটে চলে যেতে বলি। দেরি না করে আমিও জেলগেটে চলে যাই এবং ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া জেলারকে আবার গার্ডদের সতর্ক করে দিতে বলি। এরই মধ্যে ডিআইজিও জেলগেটে পৌঁছেন। বঙ্গভবন থেকে পাওয়া খবরটা আমি আবার তাঁকে জানাই।

এর পরপরই মেজর রশীদের আরেকটি ফোন পাই। তিনি আমাকে জানান, কিছুক্ষণের মধ্যেই জনৈক ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে যেতে পারেন। তিনি আমাকে কিছু বলবেন। তাকে যেন জেল অফিসে নেওয়া হয় এবং ১. জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, ২. জনাব মনসুর আলী, ৩. জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৪. জনাব কামারুজ্জামান—এই ৪ জন বন্দিকে যেন তাকে দেখানো হয়।

এ খবর শুনে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং টেলিফোনে প্রেসিডেন্টকে খবর দেওয়া হয়। আমি কিছু বলার আগেই প্রেসিডেন্ট জানতে চান, আমি পরিষ্কারভাবে মেজর রশীদের নির্দেশ বুঝতে পেরেছি কি না। আমি ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি আমাকে তা পালন করার আদেশ দেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারজন সেনাসদস্যসহ কালো পোশাক পরা ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে পৌঁছেন। ডিআইজি প্রিজনের অফিসকক্ষে ঢুকেই তিনি আমাদের বলেন, পূর্বোল্লিখিত বন্দিদের যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে তাকে নিয়ে যেতে। আমি তাকে বলি, বঙ্গভবনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আমাকে কিছু বলবেন। উত্তরে তিনি জানান, তিনি তাদের গুলি করবেন। এ ধরনের প্রস্তাবে আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে যাই। আমি নিজে এবং

ডিআইজি প্রিজন ফোনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। সে সময় জেলারের ফোনে বঙ্গভবন থেকে মেজর রশীদের আরেকটি কল আসে। আমি ফোন ধরলে মেজর রশীদ জানতে চান, ক্যাপ্টেন মোসলেম সেখানে পৌঁছেছেন কি না। আমি ইতিবাচক জবাব দেই এবং তাকে বলি, কী ঘটছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যাপ্টেন মোসলেম বন্দুকের মুখে আমাকে, ডিআইজি প্রিজন, জেলার ও সে সময় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যেখানে উপরোল্লিখিত বন্দিদের রাখা হয়েছে। ক্যাপ্টেন ও তার বাহিনীকে তখন উন্মাদের মতো লাগছিল এবং আমাদের কারও তাদের নির্দেশ অমান্য করার উপায় ছিল না। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত চারজনকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং একটি রুমে আনা হয়, সেখানে জেলার তাদের সনাক্ত করেন। ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তার বাহিনী তখন বন্দিদের গুলি করে হত্যা করে। কিছুক্ষণ পর নায়েক এ আলীর নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল সবাই মারা গেছে কি না তা নিশ্চিত হতে জেলে আসে। তারা সরাসরি সেই ওয়ার্ডে চলে যায় এবং পুনরায় তাদের মৃতদেহ বেয়নেট চার্জ করে।

স্বাক্ষর

এন জামান

মহা কারাপরিদর্শক

৫.১১.৭৫

১৫. নভেম্বরের চার তারিখ

নভেম্বরের চার তারিখ।

সকাল সাতটা।

চায়ের কাপ হাতে বঙ্গভবনে নিজের ঘর থেকে বারান্দায় এসেছেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন। মাথায় নেহেরু টুপি, কাঁধে চাদর, এক হাতে পাইপ। (তিনি বঙ্গবন্ধুর মতো পাইপ টানতেন। একই তামাক এরিন মোর ব্যবহার করতেন।)

বারান্দায় তার সেক্রেটারি কুমিল্লা বার্ড-খ্যাত মাহবুবুল আলম চাষী চিন্তিত মুখে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। মোশতাক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সুপ্রভাত।

মাহবুবুল আলম চাষী বললেন, জি স্যার। সুপ্রভাত।

মোশতাক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হৃষ্ট গলায় বললেন, তুমি কি জানো একমাত্র আমিই শেখ মুজিবুর রহমানকে তুমি করে বলতাম?

জানতাম না স্যার। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন?

তোমাকে এতদিন আপনি করে বলেছি। আজ থেকে তুমি করে বলব।

অবশ্যই বলবেন। আপনাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে। কারণটা কী বলবেন?

কারণ হচ্ছে আমি নিজ বাড়িতে ফিরে যাব। শান্তিমতো ঘুমাব। গা টেপার জন্যে লোক রাখব? সে আমাকে ঘোড়ার মতো দলাই-মলাই করবে। খালেদ মোশাররফকে বলব, বাবারে, আমি বৃদ্ধ লোক, এক পা কবরে দিয়ে রেখেছি। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা দেশ চালাও। আমার দোয়া থাকল।

চাষী বললেন, আপনার নিজের ইচ্ছায় কিছু হবে এ রকম মনে হচ্ছে না। তারপরেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আমি খালেদ ছোকড়ার কাছে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে একটা জিনিস চাইব। দিবে কি না কে জানে!

স্যার, কী চাইবেন?

একটা ট্যাংক চাইব। ট্যাংকে করে মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যাব। মাঝে মাঝে নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে যাব পাবদা মাছ কিনতে।

চাষী বললেন, চরম দুঃসময়েও আপনার রসবোধ দেখে ভালো লাগল। খন্দকার মোশতাক বললেন, এখন চরম দুঃসময়?

চাষী বললেন, অবশ্যই। কখন কী ঘটবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। Winter of Discontent.

Winter of Discontent আবার কী?

একটা উপন্যাসের নাম স্যার।

ও আচ্ছা, তুমি তো আবার অতিরিক্ত জ্ঞানী। মেজরদের মতো ইন্টারমিডিয়েট পাশ না। ভালো কথা, তোমাকে একটা উপদেশ দিয়ে যাই। কাজে লাগবে। উপদেশটা হলো, মূর্খদের সঙ্গে কখনো তর্ক করতে যাবে না।

চাষী বললেন, কেন তর্কে যাব না?

খন্দকার মোশতাক বললেন, কারণ হলো মূখরা তোমাকে তাদের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসে তর্কে হারিয়ে দিবে। এখন বুঝেছ?

চাষী বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

সকাল এগারটা।

খন্দকার মোশতাক নিজের অফিসে বসে আছেন। সঙ্গে আছেন ওসমানী। এই সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন খালেদ মোশাররফ, কর্নেল শাফায়েত জামিল এবং চারজন সশস্ত্র সৈন্য। খালেদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই, তবে কর্নেল শাফায়েত জামিলের হাতে ভোলা সাব-মেশিনগান।

শাফায়েত জামিল প্রেসিডেন্টের দিকে অস্ত্র তাক করে বললেন, আপনি খুনি। আপনার সারা শরীর রক্তে মাখা। চার নেতাকে আপনি ঠান্ডা মাথায় খুন করেছেন। আমিও আপনাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করব। You old rat!

ওসমানী প্রেসিডেন্টকে আড়াল করে খালেদ মোশাররফকে বললেন, খালেদ, তুমি ব্যবস্থা নাও। আর রক্তপাত না। প্লিজ।

খালেদ বললেন, আমি নিজেও রক্তপাত চাচ্ছি না।

খালেদের ইশারায় শাফায়েত জামিল অস্ত্র নামিয়ে বললেন, আপনারা খবর পেয়েছেন কি না আমি জানি না। সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া মেজর রউফের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পেনশন চেয়েছেন। কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন এবং খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমকে সেনাপ্রধান করার ব্যবস্থা করুন।

এতক্ষণ প্রেসিডেন্টের মুখ রক্তশূন্য ছিল, এখন কিছুটা রক্ত ফিরে এল। তিনি বললেন, হুট করে কাউকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করা যায় না। মন্ত্রিসভায় ২৬ জন মন্ত্রি আছে। তাদের অনুমোদন লাগবে।

শাফায়েত জামিল আবার অস্ত্র তাক করতেই খন্দকার মোশতাক বিড়বিড় করে বললেন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন একটা ফর্মালিটি ছাড়া কিছু না। খালেদ মমাশাররফের সেনাপ্রধান হতে আমি কোনো বাধা দেখি না। মুক্তিযুদ্ধের একজন মহাবীর বাংলাদেশের সেনাপ্রধান— ভাবতেই ভালো লাগছে।

মন্ত্রী পরিষদের সভায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হলো এবং তাঁকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তার কাধে জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিলেন এয়ার মার্শাল তোয়ব এবং এডমিরাল এম এইচ খান।

এই দিনে দু'টি বিশেষ ঘটনাও ঘটে। ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসির মিলিটারি অ্যাটাচি ব্রিগেডিয়ার ভোরা খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে আসেন। তিনি গিফট র্যাপে মোড়া উপহারের একটি প্যাকেটও নিয়ে আসেন। ব্রিগেডিয়ার ভোরার শুভেচ্ছা উপহারের ব্যাখ্যা করা হলো অন্যভাবে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান একটি ভারতীয় পরিকল্পনা। খালেদ মোশাররফের হাত ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকল বলে।

ব্রিগেডিয়ার ভোরার সৌজন্য সাক্ষাতের চেয়ে বড় ঘটনা হলো, ওইদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল শেষ হয় ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর বাড়িতে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন খালেদ মোশাররফের মা।

খালেদ মোশাররফের এক বোন আমার মা'র (বেগম আয়েশা ফয়েজ) পরিচিত। তিনি প্রায়ই আমাদের বাবর রোডের বাসায় আসতেন। ওই মহিলার কারণেই হয়তোবা আমার মা মুজিব দিবস পালনের বিষয়টা জানতেন। তিনি তাঁর ছেলেদের কিছু না জানিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। হয়তোবা তিনি ধারণা করেছিলেন ছেলেরা বিষয়টা পছন্দ করবে না। একটা বয়সের পর বাবা-মা নিজ সন্তানদের ভয় পেতে শুরু করে। সম্ভবত মা'র তখন সেই বয়স চলছিল।

ওইদিনের মিছিলটি ছিল খালেদ মোশাররফের মৃত্যুর ঘণ্টা। মিছিল দেখে লোকজন আঁতকে উঠল। তারা ধারণা করল, খালেদ মোশাররফ ভারতের চর। (দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, দেশে তখন ভারতবিদ্বেষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কারও মনেই নেই মনে রাখার চেষ্টা নেই যে, আমাদের স্বাধীনতার পেছনে হাজার হাজার ভারতীয় সৈনিকের জীবনদানের মতো ঘটনা ঘটেছে।)।

দেশে ব্যাপক প্রচারণা চলতে লাগল, লিফলেট বিলি হতে লাগল—খালেদ মোশাররফের হাত ধরে বাকশাল ফিরে আসছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে আসছে। বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে ভারতের এক করদ রাজ্য।

রাত এগারটা। সেনাপ্রধানের ফ্ল্যাগ কার অবন্তিদের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো। গাড়ির আগে ও পেছনে সেনাপ্রধানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সশস্ত্র সৈন্যদের দুটি মিলিটারি পিকআপ।

দরজা খুলল অবন্তি। অবাক হয়ে বলল, চাচা! আপনি?

খালেদ মোশাররফ বললেন, আমার রাজকন্যা মা, কেমন আছ?

আমি ভালো আছি চাচা। দাদাজান আপনাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন। আপনি ভালো আছেন তো?

হ্যাঁ। আমি যে এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান, এই খবর কি জানো?

না তো!

রেডিওতে এখনো খবর যায় নাই। কাল ভোরে চলে যাবে। খুব ঝামেলায় ছিলাম বলে তোমার মাছের দাওয়াতে আসতে পারি নি। মাছ কি ফ্রিজে কিছু তোলা আছে?

আছে।

তাহলে মাছ গরম করতে বলো। আমি দুপুর থেকে কিছু খাই নি। তোমার দাদাজান কি ঘুমাচ্ছেন?

হ্যাঁ। তার শরীর খারাপ। জ্বর এসেছে। ঘুম ভাঙাব? ডেকে তুলি?

না। উনার বয়েসী মানুষের কাঁচা ঘুম ভাঙলে সমস্যা। বাকি রাত আর ঘুম হবে না। আমি নিজে প্রচণ্ড ঝামেলায় আছি। তারপরেও তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেন, কারণটা শোনো। তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

অবন্তি বলল, আমি মারা গেছি, এরকম?

না। কারোর মৃত্যু দেখা তো ভালো স্বপ্ন। দিনের বেলা একসময় এসে স্বপ্ন বলে যাব। তুমি সেইভাবে ব্যবস্থা নিয়ো। আমি যা স্বপ্নে দেখি তা-ই হয়।

খালেদ মোশাররফ আরাম করে মাছ খাচ্ছেন। তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, আজকের খাওয়াটা আমার কাছে কেমন লাগছে জানতে চাও?

চাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় একবার সাতাশ ঘণ্টা পর প্রথম খাবার খাই। দরিদ্র এক কৃষক, নাম মিজান মিয়া। আমরা সাতজন ক্ষুধার্ত মানুষ। মিজান মিয়া খাবার দিল—গরম ধোয়াওঠা ভাত, মাষকালাইয়ের ডাল, পিয়াজ আর কাঁচামরিচ। অমৃতও এত স্বাদ হবে বলে আমি মনে করি না। খাবারটা খেয়েছিলাম মে মাসের ৯ তারিখে। ওই দিনটা আমি ঘোষণা করেছি মাষকালাই দিবস' হিসাবে। ওই দিন রাতে তোমার চাচি আমার জন্যে মাষকালাইয়ের ডাল রান্না করে। মোটা চালের ভাত রান্না হয়। আমি তৃপ্তি করে মাটির সানকিতে খাই। তোমার আজকের রান্না ওই দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নভেম্বরের চার তারিখকে আমি পাঙ্গাস দিবস' ঘোষণা করলাম। প্রতি বছর এই দিনে আমি পাঙ্গাস মাছ দিয়ে ভাত খাব।

অবন্তি বলল, চাচা, আমি কি আপনাকে একটি অন্যায় অনুরোধ করতে পারি?

পারো।

আমার স্যার শফিক সাহেব জেলহাজত থেকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা পড়ে দেখুন। চিঠি পড়লেই হবে। আমি আলাদা করে কিছু বলব না।

খালেদ মোশাররফ বললেন, তোমার স্যার খুবই সাহসী মানুষ। পনেরই আগস্টে একা মিছিল বের করে স্লোগান দিচ্ছিল–মুজিব হত্যার বিচার চাই।

অবন্তি বিস্মিত হয়ে বলল, এই ঘটনা আমি জানতাম না তো!

খালেদ মোশাররফ বললেন, সাহসী মানুষ আমি খুব পছন্দ করি। কেন জানো?

আপনি নিজে সাহসী, এইজন্যে।

না। কারণ সাহসী মানুষেরা একবারই মারা যায়। ভীতুরা মৃত্যুর আগেই বহুবার মারা যায়। ‘Cowards die many times before their death.’ বলো দেখি কার লাইন?

শেকসপীয়ার।

খালেদ মোশাররফ শফিকের লেখা চিঠিটা ভুরু কুঁচকে পড়লেন। চিন্তিত গলায় বললেন, খুনের আসামিকে হুট করে জেলহাজত থেকে ছাড়িয়ে আনা যায় না। মা, তোমাকে বুঝতে হবে যে, দেশে আইনকানুন আছে।

অবন্তি বলল, আইনকানুন থাকলে জেলখানার ভেতর চার নেতাকে খুন করা হয় কীভাবে? খালেদ মোশাররফ বললেন, তাও তো ঠিক। দেশে আইনকানুন ছিল না। তবে এখন হবে।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক তার কাঙ্ক্ষিত দেশত্যাগ করেছেন। বিচারপতি সায়েমের কাছে দায়িত্ব দিয়ে আগামসি লেনের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। শেষ হয়েছে তার আশি দিনের শাসন। তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন ভোরবেলায়, ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেন পাঁচ তারিখ মধ্যরাতে।

জেলহাজতে শফিক কম্বলের ওপর কুকুরকুণ্ডলি অবস্থায় ঘুমাচ্ছিল।

হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। সে আতংকে অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগল—আবার পাগলাঘণ্টি বাজে। আবার পাগলাঘণ্টি!

সবাই তাকে বোঝনোর চেষ্টা করল, পাগলাঘণ্টি বাজছে না। হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

শফিক বলল, ঘণ্টা বাজছে। আমি পরিষ্কার শুনেছি। এখনো ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং ঢং।

শফিক হাঁপাচ্ছে। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। শফিক তখনো জানে না খালেদ মোশাররফ তার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি রমনা থানাকে কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন—শফিক নামের মানুষটা যদি নির্দোষ হয় তাকে যেন অতি দ্রুত মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

খালেদ মোশাররফ তখনো জানেন না তার নিজের সময় ফুরিয়ে এসেছে। ক্ষমতার দাবাখেলায় তিনি হেরে গেছেন। উঠে এসেছেন জিয়াউর রহমান। নিয়তি তার ওপর প্রসন্ন ছিল, নাকি তিনি নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা পরিষ্কার না।

জিয়াউর রহমান খবর পাঠালেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে। তিনি ব্যাকুল হয়ে জানালেন, বন্ধু, আমাকে উদ্ধার করো।

কর্নেল তাহের বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিলেন। জিয়ার মুক্তির বিষয় ত্বরান্বিত হলো, কারণ সাধারণ সৈনিকেরা ছিলেন তার পক্ষে। তারা শুরু করলেন সিপাহি বিপ্লব। তারা ক্যান্টনমেন্ট কাঁপিয়ে তুললেন স্লোগানে।

'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই
হাবিলদারের উপর অফিসার নাই।'

অফিসাররা সিপাহিদের হাতে মারা পড়তে লাগলেন। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। সিপাহিদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অফিসাররা পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

১৬. সাতই নভেম্বরের ভোরবেলা

সাতই নভেম্বরের ভোরবেলাটা অবন্তির কাছে অন্যরকম মনে হলো। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি, দমকা হাওয়া। ঢাকা শহর ডুবিয়ে দেবে এমন অবস্থা। হঠাৎ আসা বৃষ্টি হঠাৎ থেমে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠল। সেই রোদ ভেজা গাছের পাতায় কী সুন্দর করেই না মিশে যাচ্ছে। অবন্তি শব্দ করে বলল, বাহ! ঢাকার নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরফরাজ খান আতংকিত গলায় বললেন, কে কথা বলে? কে?

অবন্তি বলল, দাদাজান, আমি কথা বলেছি।

সরফরাজ বললেন, তুই না। তোর গলা আমি চিনি। পুরুষের গলা। হারামজাদাটা এসেছে? আসা-যাওয়া বন্ধ করতে হবে। He has no business here. বদের বাচ্চা বদ! মতলববাজ মতলব নিয়ে ঘুরছে।

দরজা খুলে সরফরাজ বের হলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। চাপা গলায় বললেন, বদটা কই?

অবন্তি বলল, কোন বদের কথা বলছ? হাফেজ জাহাঙ্গীর?

হুঁ।

সে আসে নি দাদাজান। আমি কথা বলছিলাম। তুমি আমার কথা শুনেছ। আমার ধারণা, তোমার জ্বর বেড়েছে। জ্বরের ঘোরে মাথা এলোমলো। যাও শুয়ে থাকো।

সরফরাজ খান বললেন, আমি পরিষ্কার বদটার গলা শুনলাম। ঢাকার আকাশে যুদ্ধ'–এইসব হাবিজাবি কথা বলছে।

হাবিজাবি কথা আমি বলছিলাম। আর দাদাজান শোনো, কথায় কথায় একজন মানুষকে বদ, বদের বাচ্চা এইসব বলবে না।

বদকে বদ বলব না?

অবন্তি বলল, হাফেজ জাহাঙ্গীর আর যা-ই হোক বদ না।

তুই বুঝে ফেলেছিস?

হ্যাঁ, বুঝে ফেলেছি। তুমি বিছানায় গিয়ে শোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

সরফরাজ খান ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, আমার সেবা লাগবে না। তুই বদটার জন্যে তোর সেবা জমা করে রাখ। হাফেজ জাহাঙ্গীর এক বদ আর তুই এক বদনি।

অবন্তি বলল, ভালো বলেছ তো। বদ-বদনি। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বদবদনি।

সরফরাজ খান অবন্তির মুখের ওপর শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন। অবন্তি মগভর্তি চা নিয়ে ছাদে চলে গেল। সুন্দর একটা সকাল নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক না।

ছাদের কামিনীগাছে গত রাতে ফুল ফুটেছে। ছাদভর্তি কামিনী ফুলের সুঘ্রাণ। মগে চুমুক দিয়ে অবন্তি বলল, বাহ্ কী অদ্ভুত গন্ধ! বলতে বলতেই তার চোখে পড়ল হাফেজ জাহাঙ্গীর আসছেন। কাকতালীয় ব্যাপার তো বটেই। দাদাজান হাফেজ জাহাঙ্গীরের কথা বললেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার দেখা পাওয়া গেল। কে বলবে কেন এত ঘনঘন কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। হাফেজ জাহাঙ্গীরের হাতে বিশাল এক টিফিন ক্যারিয়ার। নিশ্চয়ই টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি উরসের খাবার। নভেম্বরের ছয় তারিখ উরস হওয়ার কথা। অবন্তি নিচে নেমে এল।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, কেমন আছ মায়মুনা?

অবন্তি বলল, মায়মুনা কেমন আছে আমি জানি না, তবে আমি ভালো আছি। টিফিন ক্যারিয়ারে কি উরসের খাবার?

খাবার না, সিন্নি। উরসের সিন্নি।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসুন।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, ঘরে ঢুকব না। এখন চলে যাব। কিছুক্ষণ আগে ইশারা পেয়েছি, আমার মা মারা গেছেন। তাঁর নামাজে জানাজা পড়তে হবে।

অবন্তি বলল, ইশারা কে দিল? আপনার পোষ জ্বিন?

জাহাঙ্গীর জবাব দিলেন না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, সিন্নিটা অজু করে খেয়ো। জীবজন্তু পশুপাখিকে খেতে দিয়ো না।

তাদের কেন সিন্নি খেতে দেওয়া যাবে না?

পশুপাখি-জীবজন্তুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব মানুষের না। এই দায়িত্ব আল্লাহপাক নিজে নিয়েছেন।

অবন্তি বলল, দরজায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর বকবক করবেন? ঘরে এসে বসুন। আমার সঙ্গে সকালের নাশতা করুন।

মায়মুনা, আমি রোজা রেখেছি।

রোজা ভাঙুন।

রোজা ভাঙব?

হ্যাঁ।

হাফেজ জাহাঙ্গীর হতভম্ব গলায় বললেন, আল্লাহপাকের নামে যে রোজা রেখেছি তা তোমার কথায় ভাঙব?

হ্যাঁ। সব মানুষের ভেতরই আল্লাহ অবস্থান করেন। কাজেই আমার কথা এক অর্থে আল্লাহপাকেরই কথা।

জাহাঙ্গীর হতাশ গলায় বললেন, আমি রোজা ভাঙব, তবে তোমার কথা আল্লাহপাকের কথা এই ধরনের আলাপ আর করবে না।

আচ্ছা করব না।

সরফরাজ খান ঘুম ভেঙে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন হাফেজ জাহাঙ্গীর নাশতা খাচ্ছেন। তার প্লেটে লুচি তুলে দিচ্ছে অবন্তি। তিনি বদটার গলা ঠিকই শুনেছেন। অবন্তি কি কোনো মতলব পাকাচ্ছে?

হাফেজ জাহাঙ্গীর সরফরাজ খানের দিকে তাকিয়ে বললেন, নাশতা খাচ্ছি এইজন্যে সালাম দিলাম না। খাওয়া-খাদ্য গ্রহণ করা হলো ইবাদত। ইবাদতের সময় মানুষকে সালাম দেওয়া যায় না।

সরফরাজ খান খড়খড়ে গলায় বললেন, কী জন্যে এসেছ?

উরসের সিন্নি নিয়ে এসেছি।

উরসের সিন্নি নিয়ে বিদায় হয়ে যাও।

জি আচ্ছা।

সরফরাজ খান বললেন, জি আচ্ছা জি আচ্ছা না। নাশতা শেষ করেই বিদায়।

জি আচ্ছা।

অবন্তি তার দাদাজানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাফেজ জাহাঙ্গীরকে বলল, আপনি নাশতা শেষ করে আমার সঙ্গে ছাদে যাবেন। ছাদে আমরা চা খাব। তারপর যাবেন।

হাফেজ জাহাঙ্গীর যখন লুচি খাচ্ছেন তখন আরেকটি কাকতালীয় ব্যাপার ঘটছে। লুচি পাচ্ছে শফিক। তার প্লেটে লুচি তুলে দিচ্ছেন রমনা থানার ওসি শামসুদ্দিন পাটোয়ারি। ওসি সাহেব তাকে জেলহাজত থেকে নিয়ে এসেছেন।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে। চা খেয়ে বাসায় চলে যান। আপনার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ নেই।

শফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে, ওসি সাহেব তার সঙ্গে তামাশা করছেন। চা-সিগারেট-মুক্তি সবই পুলিশের তামাশার অংশ। পুলিশমিলিটারি সাধারণ মানুষ না। তাদের তামাশা সাধারণ মানুষের মতো না।

শফিক নিশ্চিত, চায়ে চুমুক দেওয়ার পরপরই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। গুদামঘরের মতো কোনো ঘরে। সেখানে মার শুরু হবে। মারের প্রস্তুতি শফিক নিয়ে রেখেছে। আলিম ডাকাতের দেওয়া দুটি ট্যাবলেট তার বুকপকেটে। চা খেতে খেতে একফাকে ট্যাবলেট দুটি খেয়ে ফেলতে হবে। মার শুরু হলে দমে দমে বলতে হবে-হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম।

আল্লাহপাকের এই পবিত্র নাম পড়ার ফলে মারের কারণে কোনো ব্যথা বোধ হবে না।

শামসুদ্দিন পাটোয়ারি বললেন, আপনি চা খাচ্ছেন না, সিগারেটও খাচ্ছেন। ব্যাপার কী?

শফিক বলল, ভয় লাগছে স্যার।

শামসুদ্দিন বললেন, আমাকে বলা হয়েছে আপনি অতিসাহসী একজন মানুষ। আর আপনি ভয় পাচ্ছেন?

পাচ্ছি স্যার।

আপনাকে সাহসী মানুষ কে বলেছে জানতে চান?

জি-না, চাই না।

আশ্চর্য ব্যাপার! জানতে চাইছেন না কেন? আপনাকে সাহসী মানুষ বলেছেন সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ। তিনি ভুল কথা বলার মানুষ না। উনার কারণেই তড়িঘড়ি করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বুঝেছেন?

জি স্যার।

আপনি তো ঢাকাতেই থাকবেন?

শফিক বলল, জি-না স্যার। গ্রামে মায়ের কাছে চলে যাব। আর আসব না। ঢাকা শহর আমার মতো অভাজনের জন্যে না।

শামসুদ্দিন বললেন, অভাজন মানে কী?

শফিক বলল, অভাজন হলো আমজনতা।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক তাঁর আগামসি লেনের ছাদে পাটি পেতে বসে আছেন। তাকে সকালের নাশতা দেওয়া হয়েছে। এখানেও লুচি। লুচির সঙ্গে নেহারি। তিনি নাশতা খাওয়া শুরু করেন নি। পাশে রাখা ফিলিপস ট্রানজিস্টার রেডিওতে সকালের খবর শুনছেন। তবে তাঁর দৃষ্টি চিলেকোঠার দরজার দিকে। তাঁর মনে হচ্ছে দরজার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। তিনি তামাকের গন্ধও পাচ্ছেন। পরিচিত গন্ধ—এরেন মোর।

খন্দকার মোশতাক বললেন, কে ওখানে? কে?

ভারী গলায় কেউ-একজন বলল, আমি। এই গলার স্বর খন্দকার মোশতাকের অতি পরিচিত। তার শরীর হিম হয়ে গেল। বুকে ব্যথা শুরু হলো। ইদানীং তাঁর এই সমস্যা হচ্ছে—তিনি মৃত মানুষদের আশপাশে দেখতে পাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছেন। মনে হয় তিনি দ্রুত মস্তিষ্কবিকৃতির দিকে যাচ্ছেন।

গত রাতে ঘুমাবার সময় দেখলেন, হামিদ তার বিছানার এক কোনায় বসে আছে। হামিদ লঞ্চডুবিতে পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। হামিদের কাজ ছিল তার গা, হাত-পা টিপে দেওয়া।

মৃত একজন মানুষকে তার বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখে মোশতাক সাহেবের বুকে ধাক্কার মতো লাগল। তার হাঁপানির টান উঠে গেল। হামিদ বলল, স্যারের শইল কেমুন?

মোশতাক বললেন, ভালো। শইল টিপার লোক কি রাখছেন?

না।

হামিদ বলল, আছেন আর অল্প কিছুদিন। শইল টিপার লোক না হইলেও চলবে।

হামিদের কথা শুনে মোশতাক হতভম্ব। অল্প কিছুদিন আছেন—এর মানে কী? তিনি এখন সবকিছু থেকে অবসর নেওয়া একজন মানুষ। মারামারি কাটাকাটির মধ্যে তার থাকার কিছু নেই। তিনি চেষ্টায় আছেন কানাডায় তার ভাগ্নির কাছে চলে যেতে। দেশ গোল্লায় যাওয়া শুরু করেছে, গোল্লায় যাক। তিনি কানাডার মন্ট্রিলে থাকবেন তার ভাগ্নির কাছে। সেখানে বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে নাকি হরিণ আসে। হাত থেকে খাবার খায়। তিনি সেখানে হরিণকে খাবার খাওয়াবেন। খুব যখন ঠান্ডা পড়বে তখন ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আগুন তাপাবেন।

লালপানি খাওয়ার অভ্যাস তার নেই। তবে শীতের দেশে খাওয়া যেতে পারে। কথায় আছে—যস্মিন দেশে যদাচার। খুব ঠান্ডা পড়লে লালপানির বোতল নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলে কার কী বলার থাকবে? আর যাই হোক ছোকড়া মেজররা তাকিয়ে থাকবে না।

খালেদ মোশাররফ কফির মগ হাতে বসে আছেন। সিপাহী বিদ্রোহের কথা তাকে জানানো হয়েছে। অবস্থা যে ভয়াবহ এই খবরও দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সৈনিকদের হইচই এবং স্লোগান শোনা যাচ্ছে। শুধু স্লোগান দিয়েই তারা চুপ করে থাকছে না, কিছুক্ষণ পরপর আকাশে গুলি বর্ষণ করছে। তাদের স্লোগান হলো

সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই
অফিসারদের রক্ত চাই।

খালেদ মোশাররফ অফিস মেসে বসে আছেন। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। তবে তার দীর্ঘদিনের সাথী রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটে আসা মেজর হুদা ও মেজর হায়দারকে আতংকে অস্থির হতে দেখা গেল। তারা বারবার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে নানান জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন। একটা পর্যায়ে খালেদ মোশাররফ বললেন, নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষা করে নিজেদের ছোট না করে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হওয়া ভালো।

খালেদ মোশাররফ সিগারেট ধরিয়ে তার স্ত্রী সালমাকে টেলিফোন করে এই মুহূর্তে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যেতে বললেন।

সালমা বললেন, তোমাকে একা ছেড়ে যাব?

মোশাররফ বললেন, হ্যাঁ। আমার তিন মেয়েকে টেলিফোন দাও, এদের গলার শব্দ শুনি। কে জানে হয়তো আর শুনব না।

সালমা আর্তধ্বনি বের করলেন, এইসব কী বলছ?

খালেদ মোশাররফ বললেন, আমার তিন রাজকন্যাকে দাও।

তিনি তাঁর কন্যাকে বললেন, তোমাদের মধুর হাসি, ভালোবাসি ভালোবাসি।

মেয়েদের সঙ্গে এটি তার পুরোনো খেলা। বাবার গলা শুনে তিন মেয়েই খিলখিল করে হাসছে। এরপর তিনি টেলিফোন করলেন সরফরাজ খানকে। তাঁদের মধ্যে কী কথা হলো জানা গেল না, তবে সরফরাজ খান তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে বের হলেন। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। তিনি আর ফিরে এলেন না। তার বেবি অস্টিন গাড়ি ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সাতই নভেম্বর খালেদ মোশাররফকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবের নামে অফিসার হত্যার ব্যাপারটা সাধারণ সৈনিকেরা করত। খালেদ মোশাররফের ব্যাপারে এই দায়িত্ব দু'জন অফিসার পালন করেন। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন আসাদ ও ক্যাপ্টেন জলিল। মজার ব্যাপার হলো, এই দু'জনকেই খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত পছন্দ করতেন। কে ফোর্সের অধীনে এই দু'জন খালেদ মোশাররফের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন আসাদকে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা বীরউত্তম খালেদ মোশাররফের মৃতদেহ ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় খেজুরগাছের নিচে অপমানে ও অবহেলায় পড়ে আছে। রাস্তার একটা কুকুর অবাক হয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

কালাপাহাড়ও অবাক হয়ে শফিককে দেখছে। সে আনন্দ সামলাতে পারছে না। শফিক বসে আছে মোল্লার চায়ের দোকানের সামনের বাঁশের বেঞ্চে। কালাপাহাড় কিছুক্ষণ পরপর শফিককে চক্কর দিচ্ছে। প্রতিবারই চক্কর শেষ করে সে শফিককে দেখছে। শফিক বলল, কিরে আমাকে দেখে খুশি হয়েছিস?

কালাপাহাড় ঘোঁত জাতীয় শব্দ করল।

শফিক বলল, বিরাট ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। উদ্ধারের আশা ছিল না। খালেদ মোশাররফ সাহেবের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছি। শোন কালাপাহাড়, আমি যত দিন বেঁচে থাকব খালেদ সাহেবের গুণগান করব। তুইও করবি।

কালাপাহাড় আবারও ঘোঁত শব্দ করল।

শফিক বলল, এই ক'দিন খাওয়াদাওয়ার খুব কষ্ট হয়েছে। আর হবে না। মা'কে যখন দেখতে যাব, তোকেও নিয়ে যাব। ঠিক আছে?

কালাপাহাড় জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়ল। শফিক বলল, খালেদ মোশাররফ সাহেব আমার যে উপকার করেছেন তা আমি কোনোদিন ভুলব না। যেদিন ভুলব সেদিন থেকে আমি কুকুরের বাচ্চা।

কর্নেল তাহের তাঁর অনুগত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে সিপাহী বিপ্লবের সূচনা করেন। সিপাহীরা গগনবিদারী স্লোগান দিতে শুরু করল—'জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ'। কর্নেল তাহেরকে জড়িয়ে ধরে আবেগমথিত কণ্ঠে জিয়া বললেন, বন্ধু! তোমার এই উপকার আমি কোনোদিনই ভুলব না।

জেনারেল জিয়া কর্নেল তাহেরের উপকার মনে রেখেছিলেন কি না তা আমরা জানি না, তবে তিনি যে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছিলেন তা আমরা জানি।

দুঃখিনী বাংলাদেশের প্রদীপসম সন্তানেরা একে একে নিভে যেতে শুরু করল।

রাত একটা। অবন্তি ছাদে বসে আছে। খালেদ মোশাররফের মৃত্যুসংবাদ সে কিছুক্ষণ আগে পেয়েছে। অনেক ঝামেলা করে সে এই খবর পেয়েছে কর্নেল তাহেরের কাছ থেকে।

কর্নেল তাহেরকে অবন্তি ভালো চেনে। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তিনি অবন্তিদের বাড়িতে দু'বার এসেছেন। দেশ পরিচালনায় তাঁর চিন্তাভাবনা অবন্তিকে আগ্রহ নিয়ে বলেছেন।

অবন্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল, তাহের চাচা, উনি কি বীরের মতো মারা গেছেন?

কর্নেল তাহের বললেন, হ্যাঁ। তিনি মেজর হুদাকে বলেছিলেন, সাধারণ সৈনিকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের হত্যা করবে। তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা করে নিজেকে ছোট করবে না। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। নাও একটা সিগারেট খাও। তাঁকে যখন গুলি করা হয় তখন তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতেই সিগারেট টানছিলেন। অবন্তি মা, কাঁদবে না। Be a

brave girl, খালেদ মোশাররফের ধ্যান-ধারণা আমার পছন্দ না রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। তারপরেও সাহসী মানুষ হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

অবন্তি তার দাদাজানের অপেক্ষায় পুরো রাত ছাদে জেগে কাটাল। ভোররাতে সে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল। এই দৃশের কথা পরে বিস্তারিত বলা হবে।

১৭. রাধানাথ বাবুর আদর্শলিপি প্রেসের সামনে

রাধানাথ বাবুর আদর্শলিপি প্রেসের সামনে শফিক দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক বুঝতে পারছে না— সে কি বাড়িতে ঢুকবে, নাকি গেট থেকে চলে যাবে? যে মানুষটার জন্যে এই বাড়ি তার নিজের মনে হতো, সেই মানুষ তো নেই। আজ আর তাকে কেউ বলবে না, টিসিবির একটা স্লিপ আছে, নিয়ে যাও। একটা প্যান্ট বানাও। এক প্যান্ট কত দিন পরবে? প্যান্ট বেচারারও তো বিশ্রাম দরকার।

শফিকের পাশেই কালাপাহাড়। সে থাবা গেড়ে বসে আছে। তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। শফিক বলল, কালাপাহাড়, ভেতরে যাব? নাকি গেট থেকে চলে যাব?

কালাপাহাড় ঘেউ করে জবাব দেওয়ার আগেই আদর্শলিপি প্রেসের পিয়ন ফণির গলা শোনা গেল, আরে শফিক স্যার!

শফিক বলল, কেমন আছ ফণি?

ফণি বলল, আমরার কথা বাদ দেন। আপনে ছিলেন কই? আপনেরে সবে। মিল্যা হারিকেন জ্বালায়া খুঁজতাছে। আপনেরে না পাইয়া ম্যানেজার শশাংক বাবু পাগলা কুত্তার মতো হইছেন।

প্রেসের ভেতর থেকে ট্রেডল মেশিনের ঘটঘট শব্দ আসছে। এর অর্থ মেশিন চলছে। জগতে কারও জন্যে কিছু আটকে থাকে না, এটাই মনে হয় আদি সত্য।

স্যার, ভিতরে আসেন। ম্যানেজার সারের সঙ্গে কথা বলেন। উনি আপনের জন্যে বিশেষ ব্যস্ত।

শশাংক তার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত শুনে শফিক খানিকটা গুটিয়ে গেল। প্রেসের ম্যানেজার শশাংক তাকে কোনো-এক বিচিত্র কারণে অপছন্দ করে। শফিক বলল, আমাকে প্রয়োজন কেন?

শশাংক বাবুরে জিগান, সে-ই আপনেরে বলবে। আপনের জন্যে বিরাট ভালো খবর আছে।

শফিক বলল, বিরাট ভালো খবরটা তোমার মুখেই শুনি।

ফণি বলল, রাধানাথ বাবু এই প্রেস আর তার বিষয়সম্পত্তি সব আপনেরে দিয়া গেছেন। তার মৃত্যু হইলে আপনেরে মুখাগ্নি করতে বলে গেছেন। আপনেরে না পাইয়া শশাংক বাবু মুখাগ্নি করেছেন।

হতভম্ব শফিকের মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা স্বপ্নের কোনো অংশ। স্বপ্নে অতি অবাস্তব বিষয়ও বাস্তব মনে হয়। রাধানাথ বাবু কেন শুধু শুধু শফিককে সব দান করবেন? সে তার কে? বিষয়টা স্বপ্নে ঘটছে। ইচ্ছাপূরণ স্বপ্ন। শফিক এক ধরনের ঘোর নিয়ে প্রেসে পা দিল। ম্যানেজারের খুপড়ি ঘরে প্রবেশ করল।

ম্যানেজার শশাংক বললেন, খবর পেয়েছেন না?

কী খবর?

রাধানাথ বাবুর সব বিষয়সম্পত্তির আপনি ওয়ারিশ।

শফিক বলল, কেন?

শশাংক বিরক্তমুখে বললেন, আমি কী করে বলব কেন? যিনি বলতে পারতেন তিনি খুন হয়েছেন। আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে। সব আমার কাছ থেকে বুঝে নিন। আমি এই পাজির দেশে থাকব না। ইন্ডিয়া চলে যাব। ইন্ডিয়াতে আমার জ্যাঠা আছেন। প্রেস চালাবার জন্যে আপনার একজন ভালো ম্যানেজার লাগবে। প্রেস বিক্রি করে ক্যাশ টাকাও নিতে পারেন। যেটা আপনার ইচ্ছা। যদি বিক্রি করতে চান, আমাকে বলবেন। আমার হাতে ভালো খদ্দের আছে।

ম্যানেজার চোখমুখ কুঁচকে শফিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার হাতে পাইপ। তিনি বেশ কায়দা করে পাইপে টান দিচ্ছেন। শফিক এই পাইপ চেনে। রাধানাথ বাবুর পাইপ।

রাধানাথ বাবু উইল করে শফিককে যা দিয়ে গেছেন তা হলো—

১. ধানমণ্ডি তিন নম্বর রোডে দশ কাঠার একটি জমি। জমির ওপর বিশাল একতলা বাড়ি আছে। বাড়িটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের কাছে ভাড়া দেওয়া।

২. একটি ভক্স ওয়াগন গাড়ি এবং একটি পিকআপ। পিকআপ পুরোনো হলেও ভক্স ওয়াগন গাড়িটা নতুন।

৩. ব্যাংকে জমা একুশ লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা।

৪. আদর্শলিপি ছাপাখানা।

৫. মোহাম্মদপুরে বিশ কাঠার একটা প্লট।

৬. সাভারে দশ একর জায়গা নিয়ে একটা বাগানবাড়ি।

শশাংক বাবু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, ভগবান যাকে দেন দশ হাতে দেন। আপনাকে দিয়েছেন। ছিলেন স্ট্রিটবেগার। হয়েছেন মহারাজা।

শফিক বলল, ভগবান আমাকে কিছু দেন নি। রাধানাথ বাবু দিয়েছেন।

জিনিস একই। ভগবান তো নিজের হাতে কিছু দিবেন না। অন্যের হাতেই দিবেন। যাই হোক, বিষয়সম্পত্তি, ব্যাংকের টাকাপয়সা সবই আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিব। কোনো ঝামেলা করব না। বিনিময়ে আপনি আমাকে দশ লাখ টাকা দিবেন। খালি হাতে ইন্ডিয়া যেন না যাই। রাজি আছেন? মাত্র দশ লাখ চেয়েছি। সামান্যই চেয়েছি।

ম্যানেজার শশাংকের কথার জবাব না দিয়ে আচমকা শফিক বলল, আপনি কি পুলিশের কাছে রাধানাথ বাবুর খুনির সন্দেহভাজনের তালিকায় আমার নাম বলেছেন?

শশাংক বললেন, বলতে পারি। তখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। আপনার নাম মনে এসেছে, বলে ফেলেছি। এই তথ্য জেনেছেন কার কাছ থেকে? পুলিশের কাছ থেকে?

শফিক বলল, এটা আমার অনুমান। আমার অনুমানশক্তি ভালো। আমি অনুমানে পাচ্ছি রাধানাথ বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে আপনি জড়িত। রাধানাথ বাবু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে যারা জড়িত, তারা কেউ পার পাবে বলে আমি মনে করি না। Everybody is paid back by his own coin. সবাইকে নিজের পয়সায় হিসাব দিতে হয়। আপনাকেও দিতে হবে।

আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন?

না। আমি কাউকে ভয় দেখাই না।

শশাংক গলা নিচু করে বললেন, শফিক সাহেব শোনেন। আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে প্রয়োজন, এটা মাথার মধ্যে রাখবেন। দলিল-দস্তাবেজ গাপ করে দিলে আপনি কিছুই পাবেন না। বুড়া আঙুল চুষবেন। রাধানাথ বাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাগ্নে আছে। পরিমল। বিরাট মস্তান। সিনেমাহলের গেটকিপার। সে খবর পেলে ছুটে এসে সবকিছু দখল করবে। বুঝলেন ঘটনা?

শফিক চুপ করে রইল। শশাংক বললেন, এত বড় বিষয়সম্পত্তি পেয়েছেন, আসুন সেলিব্রেট করি। মাল খাওয়ার অভ্যাস আছে?

মাল কী?

কারণ বারিকে বলে মাল। সহজ ভাষায় মদ। দেবদাস যে জিনিস খেয়ে লিভার পচিয়ে ফেলেছিল সেই জিনিস।

আমার মদ্যপানের অভ্যাস নেই।

অভ্যাস নেই, অভ্যাস করুন। নিজের রোজগারের ধন উড়ানো যায় না। পরের ধন উড়ানো যায়। আমার কাছে ভালো বিলাতি জিনিস আছে। স্কটল্যান্ডে যেই জিনিসের জন্ম। আসুন দুই ভাই মিলে ফিনিশ করে দেই।

শফিক বলল, আপনি একা ফিনিশ করুন, আমি এখন উঠব।

যাবেন কোথায়? রাধানাথ বাবুর শোবার ঘরে শুয়ে থাকুন। সবই তো আপনার।

শফিক কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল। শশাংক বললেন, রিকশা করে কিংবা হেঁটে হেঁটে যাবেন না। এখন আপনার গাড়ি আছে। চলাফেরা করবেন গাড়িতে। যে কদিন পারেন পরের ধনে পোদ্দারি করে যান। আসমান থেকে যে ধন আসে সেই ধন আবার আসমানে উঠে যায়। বুঝলেন?

বোঝার চেষ্টা করছি।

শশাংক বললেন, বুড়ো রাধানাথ কেন সব সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে গেছে তার কারণ আমি বের করেছি। শুনতে চান?

চাই।

আপনার যেমন অনুমানশক্তি ভালো, আমারও ভালো। চিরকুমার রাধানাথ বাবুর আপনি ছিলেন যৌনসঙ্গী। চিরকুমারদের মধ্যে এইসব আলামত থাকে।

শফিক বলল, মহাপুরুষ পর্যায়ের একজন মানুষকে আপনি আপনার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন।

শশাংক মুখ কুঁচকে বললেন, মহাপুরুষ মহাপুরুষ করবেন না। মহাপুরুষ থাকে ডিকশনারিতে। ডিকশনারির বাইরে থাকে বিকারগ্রস্ত পুরুষ।

শফিকের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে তা তাকে দেখলে মনে হবে না। সে মাথা নিচু করে হাঁটছে। তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে কালাপাহাড়। শফিক কালাপাহাড়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুচ্ছে। শফিকের এখন ধারণা কালাপাহাড় তার সব কথা বুঝতে পারে।

কেমন আছিসরে কালাপাহাড়? ভালো থাকলে একবার ঘেউ করবি। খারাপ থাকলে দুইবার।

ঘেউ।

তাহলে ভালোই আছিস! গুড। আমিও ভালো আছি। লটারির টিকিট পেয়েছি। লটারি কী বুঝিস? বুঝতে পারলে একবার ঘেউ বলবি। না পারলে দুইবার।

ঘেউ ঘেউ।

লটারি হলো কোনো কারণ ছাড়াই টাকাপয়সা পাওয়া। আরও সহজ করে বলি। মনে কর, তুই একা একা হাঁটছিস। হঠাৎ আকাশ থেকে তোর সামনে একটা প্যাকেট পড়ল। তুই কাছে গিয়ে দেখলি প্যাকেটভর্তি বিরিয়ানি। চালের চেয়ে মাংস বেশি। কী বললাম, বুঝতে পারলি? বুঝতে পারলে একবার ঘেউ কর।

ঘেউ।

রাতে কী খেতে চাস বল। লটারির খানা খাবি? লটারির খানা কী জিনিস বুঝতে পারছিস না? আমরা অবন্তিদের বাড়িতে যাব। অবন্তি দরজা খুললে তাকে বলব, অবন্তি, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। কোনো খাবারের ব্যবস্থা কি করতে পারবে? অবন্তি যেসব খাবার সামনে দেবে তা হবে লটারির খাবার। বুঝেছিস?

অবন্তিদের বাড়িতে অবন্তি গত তিন দিন হলো সম্পূর্ণ একা বাস করছে। কাজের মেয়ে রহিমা একবেলার জন্যে তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিল, আর ফিরে নি। বাড়ির দারোয়ান কালাম কাজের মেয়ের খোঁজে গিয়ে আর ফিরে নি। অবন্তির ধারণা, পুরো ঘটনাটা এই দু'জন যুক্তি করে ঘটিয়েছে। টাকাপয়সাও সরিয়েছে।

সরফরাজ খানের বিছানার পাশের টেবিলে লালরঙের ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিও ছিল। সেই রেডিও এখন দেখা যাচ্ছে না।

কালাম না ফেরায় অবন্তি আনন্দিত। সরফরাজ খান নিখোঁজ হওয়ার পরপরই কালামের আচার-আচরণে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। সে অন্যরকম দৃষ্টিতে এখন অবন্তিকে দেখে। এইসব দৃষ্টি মেয়েরা খুব ভালো বুঝতে পারে।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর অবন্তি এসে দরজা খুলল। শফিক বলল, ঘরে কি কোনো খাবার আছে? আমি এবং কালাপাহাড় আমরা দুজনেই খুব ক্ষুধার্ত।

আছে। ঘরে প্রচুর খাবার আছে।

তোমাকে এমন অসুস্থ লাগছে কেন? শরীর খারাপ?

অবন্তি বলল, শরীর ঠিকই আছে, শুধু আমার দাদাজান নিখোঁজ হয়েছেন।

বলো কী?

আমার ধারণা উনি মারা গেছেন। আপনার পক্ষে কি আজ রাতটা এই বাড়িতে থাকা সম্ভব? আমি একা বাস করছি। রাতে একফোটা ঘুমাতে পারছি না।

শফিক বলল, আমি থাকব, কালাপাহাড় থাকবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও।

অবন্তি বলল, থ্যাংক ইউ।

শফিক বলল, আমি সকাল থেকেই তোমার দাদাজানের খোঁজে নেমে পড়ব। পাত্তা বের করে ফেলব। কালাপাহাড়কে রেখে যাব, সে তোমাকে পাহারা দেবে।

কালাপাহাড় চাপা আওয়াজ করছে। সে বসেও নেই, শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাকে ভীত এবং শংকিত মনে হচ্ছে। অবন্তি বলল, আপনার কুকুরটা এরকম করছে কেন?

শফিক বলল, জানি না কেন এরকম করছে।

অবন্তি বলল, আমি জানি কেন এরকম করছে। আপনি খাওয়াদাওয়া শেষ করুন, তারপর আপনাকে বলব। শুনে আপনার বিশ্বাস হবে না। তবে আমি মিথ্যা বলি না। আমার দাদাজানের, আমার বাবা এবং মা'র প্রচুর মিথ্যা বলার অভ্যাস। কিন্তু আমি এই সমস্যা থেকে মুক্ত।

রাত এগারটা বাজে। শফিক রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে গেছে। তাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে গেস্টরুমে। অবন্তি জগভর্তি পানি এবং গ্লাস দিয়ে গেল। শফিক বলল, আমার কিছু লাগবে না। তুমি ঘুমুতে যাও।

অবন্তি বলল, আমি পাঁচ মিনিট পরে যাব। আমি একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছি। এই দৃশ্যের কথা বলব। আপনি ঠান্ডা মাথায় শুনবেন। যদি কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করতে পারেন সেটাও বলবেন।

শফিক বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব টেনড্‌। গল্প বলে টেনশন কমাও। আমার নিজের জীবনে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে তোমাকে কাল ভোরে বলব। এখন তোমার গল্প শুনি।

অবন্তি গল্প শুরু করল।

সাতই নভেম্বরের কথা। দাদাজান ফিরছেন না। ঘরে আমি আর রহিমা। দারোয়ান কালামকে পাঠিয়েছি দাদাজানের পরিচিত সব বাসায়। কেউ যদি কোনো খবর দিতে পারে।

তখন রাত বারোটার ওপর বাজে। আমি ছাদে বসে আছি। ছাদ থেকে অনেকদূর দেখা যায়। রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ফাঁকা। কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত নেই। হঠাৎ দেখি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা একজন লোক আসছে। তার মধ্যে কোনো-একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা ধরতে পারছি না।

লোকটা যখন এসে আমাদের বাড়ির গেটের দরজা খুলল তখন সমস্যাটা ধরতে পারলাম। তার চোখ নেই, মুখ নেই, নাক নেই। আমি ভয়ে আতংকে অস্থির হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি। সে গেট খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

জিনিসটা কী আমি জানি না। তবে সে এই বাড়িতেই আছে তা জানি। কুকুরবিড়ালরা এইসব বুঝতে পারে বলেই আপনার কুকুর এত হইচই করছিল।

শফিক বলল, Oh God!

অবন্তি বলল, ভয়ংকর গল্প না?

শফিক বলল, অবশ্যই ভয়ংকর।

অবন্তি হতাশ গলায় বলল, আমি বুঝতে পারছি—আমার এ বাড়িতে থাকা ঠিক না। যে-কোনো সময় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। কিন্তু আমি কোথায় যাব বলুন? আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

তুমি তোমার মার কাছে চলে যাও।

মা টিকিট পাঠাবে বলেছিল। এখনো পাঠায় নি। তা ছাড়া আমার পাসপোর্টও করা নেই।

শফিক বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

হঠাৎ শফিক চুপ করল। বিস্মিত হয়ে তাকাল অবন্তির দিকে।

অবন্তি বলল, মনে হচ্ছে না ছাদে কেউ হাঁটছে?

শফিক বলল, হ্যাঁ।

অবন্তি বলল, ওই জিনিসটা হাঁটছে। আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে চলুন দু'জন মিলে ছাদে যাই। চাক্ষুষ দেখি ঘটনা কী।

শফিক বলল, আমি সাহসী মানুষ না অবন্তি। আমি ভীতু মানুষ। ছাদে কী হচ্ছে তা জানার দরকার নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার ঘুম হবে না। আমি সারা রাত জেগেই থাকব। তাতে সমস্যা নেই।

কালাপাহাড় চাপা স্বরে ডেকেই যাচ্ছে। সে কী দেখছে, কে জানে!

১৮. ক্যান্টনমেন্টের উত্তাপ

ক্যান্টনমেন্টের উত্তাপ ঢাকা শহরে প্রবেশ করল না। শহর তার নিজের নিয়মে চলতে লাগল। শান্ত নিস্তরঙ্গ ঢাকা শহর।

মাঠাওয়ালারা মাঠা মাঠা বলে মাঠা বিক্রি করতে লাগল। ধুনুরিরা কাঁধে ধুন নিয়ে লেপ-তোষক সারাইয়ে নেমে গেল। ছুরি-কাঁচি ধার করানোর লোকও নামল। মিষ্টি গলায় বলতে লাগল, ছুরি-কাঁচি ধার করাইবেন? সে বছর প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ল। আমি আমার জীবনে এত সস্তা ইলিশ দেখি নি। ইলিশ মাছ সস্তা হওয়া মানে অন্যান্য মাছ ও শাকসবজির দাম কমে যাওয়া। তা-ই হলো। ঢাকা শহরবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাদের কাছে মনে হলো জিয়া সরকার দেশের জন্য মঙ্গল নিয়ে এসেছে।

আমি তখন খুবই কষ্টে জীবন কাটাচ্ছি। বাবার পেনশনের সামান্য টাকা এবং কেমেস্ট্রির লেকচারার হিসেবে আমার বেতনে ছয় ভাইবোন এবং মাকে নিয়ে বিশাল সংসার চলছে। চলছে বলা ঠিক হবে না, আটকে আটকে যাচ্ছে। গাড়ি চলে না চলে না'-টাইপ চলা। মাসের শেষদিকে আমাকে এবং মা'কে ধারের সন্ধানে বের হতে হচ্ছে। ধার দেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যাও তখন সীমিত। যারা আছেন তারা আমাকে এবং মা'কে ধার দিতে দিতে ক্লান্ত বিরক্ত।

এই প্রবল দুঃসময়ে বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদত ভাই একদিন আমাকে বললেন, বিচিত্রা গ্রুপ থেকে বাচ্চাদের একটা পত্রিকা বের হবে। প্রথম সংখ্যায় একটা লেখা দিতে পারবেন?

আমি এত জোরে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম যে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। রাত জেগে লিখলাম নীলহাতি। শিশু-কিশোরদের জন্যে জীবনের প্রথম লেখা। এই লেখার চালিকাশক্তি সাহিত্যসৃষ্টি ছিল না, কিঞ্চিত অর্থোপার্জন ছিল।

লেখা প্রকাশিত হলো এবং আমি সম্মানী হিসেবে কুড়ি টাকা পেলাম। পরিষ্কার মনে আছে— এই টাকায় এক সের খাসির মাংস, পোলাওয়ের চাল এবং ঘি কেনা হলো। অনেকদিন ভালো খাবার খাওয়া হয় না। একদিন ভালো খাবার।

গ্রামবাংলায় একটি কথা চালু আছে, যেদিন উত্তম খাবার রান্না হয় সেদিন যদি হঠাৎ কোনো অতিথি উপস্থিত হন তখন ধরে নিতে হবে উত্তম খাবারের উপলক্ষ

সে অতিথি। তখন অতিথিকে যথাযোগ্য সমাদর করতে হবে।

ঘরে পোলাও, খাসির রেজালা এবং ডিমের কোরমা রান্না হয়েছে। বাসায় অপরিচিত একজন অতিথিও এসেছেন। ছোটখাটো মানুষ, গাত্রবর্ণ কালো। সারাক্ষণ হাসছেন। তাঁর নাম আশরাফুন্নিসা। কর্নেল তাহেরের মা। তিনি নাকি কাছ থেকে কোনো লেখক দেখেন নি। লেখক দেখতে এসেছেন।

তিনি আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, হুমায়ূন ব্যাটা! আমাকে সালাম করো। আমি তোমার আরেক মা।

আমি তৎক্ষণাত তাঁকে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথার ঘ্রাণ কে বললেন, ঠিক আছে।

কী ঠিক আছে তা কখনো তাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

আমি তাকে না চিনলেও তার ছোট ছেলে আনোয়ারকে খুব ভালো করে চিনি। আনোয়ার তখন আমার মতোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। মাঝে মধ্যে ক্লাসের শেষে আমরা দু'জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বসে চা খাই।

আনোয়ারের মাথায় বিপ্লবী সিরাজ সিকদার এবং তার ভাই কর্নেল তাহের নানান আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেইসব আইডিয়ার কারণে আনোয়ারের সব গল্পই দেশ বদলে দেওয়ার গল্প। তবে আনোয়ার যে সিরাজ শিকদার গ্রুপের এক সক্রিয় সদস্য তা আমাকে সে জানায় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের লাউঞ্জে আনোয়ারের সব গল্প শেষ হয় চা শেষ করে একটা কথায় হুমায়ূন, চলো তো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

তাহের ভাইয়ের কাছে। উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

উনি আমাকে চেনেন কীভাবে?

আমি তোমার কথা ভাইজানকে বলেছি, উনি তোমার বইও পড়েছেন। আমরা সব ভাইবোন বইয়ের পোকা।

আজ না। আরেক দিন যাব।

কবে যাবে?

কোনো-এক শুভদিনে যাব।

আনোয়ারের তখন পুরনো একটা মোটর সাইকেল ছিল। তাকে অকারণে মোটর সাইকেলে ঘুরতে দেখতাম।

আনোয়ার এবং কর্নেল তাহেরের মা বেগম আশরাফুন্নিসাকে আমি আমার মায়ের মতোই দেখেছি। তিনি আমাকে ডাকতেন হুমায়ূন ব্যাটা'। তাঁর ডাকের সঙ্গে আমার বাবার ডাকেরও মিল ছিল। বাবা আমাকে ডাকতেন—বড় ব্যাটা হুমায়ূন'।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা আমার নিজের খুব পছন্দের বই আগুনের পরশমণি আমি বেগম আশরাফুন্নিসাকে উৎসর্গ করি।

উৎসর্গপত্রে লেখা–

বীর প্রসবিনী
বেগম আশরাফুন্নিসা
কর্নেল তাহেরসহ
আটজন মুক্তিযোদ্ধার জননী।

উৎসর্গপত্রে সামান্য ভুল আছে। বেগম আশরাফুন্নিসা আটজন মুক্তিযোদ্ধার জননী না, তিনি নয়জন মুক্তিযোদ্ধার জননী। তাঁর সাত পুত্র এবং দুই কন্যা মুক্তিযোদ্ধা। এই নয়জনের মধ্যে চারজন মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্যে বীরত্বসূচক পদকের অধিকারী। কর্নেল তাহের বীর উত্তম, এক ভাই ইউসুফ বীর বিক্রম, দুই ভাই বীর প্রতীক। এই বীর প্রতীক এঁরা পেয়েছেন দু'বার করে।

এই প্রসঙ্গে আমি আবার ফিরে আসব। এখন চলে যাই নীলহাতি'তে।

খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানির মালিক খান সাহেব 'নীলহাতি' বই হিসেবে ছাপাতে রাজি হলেন। তবে বিরক্ত মুখ করে বললেন, আপনি যে সব লিখছেন বাচ্চারা এইগুলা পড়বে না। ছোট ছোট ডিটেকটিভ বই লেখেন। স্বপন কুমার টাইপ দুই টাকা সিরিজের—মাসে দু' মাসে একটা করে বের হবে। পারবেন?

আমি বললাম, জি পারব।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ থেকে এক শ টাকা দিলেন ডিটেকটিভ বইয়ের জন্যে অগ্রিম সম্মানী। তিনি বললেন, একটা ডিটেকটিভ বই আগে লিখে দেন, তারপর আমি আপনার 'নীলহাতি' ছাপব। নীলহাতি বইয়ের সুন্দর কভার লাগবে। কাইয়ুম চৌধুরীকে দিয়ে হবে না, উনি দশ বছর লাগাবেন। দেখেন অন্য কাউকে পান কি না।

নীলহাতির প্রচ্ছদশিল্পী খুঁজতে গিয়ে আমার আদর্শলিপি প্রেসের শফিকের সঙ্গে পরিচয়।

শফিক ছোটখাটো মানুষ। শ্যামলা রঙ। চোখের পাপড়ি মেয়েদের মতো দীর্ঘ বলেই হয়তো চেহারায় মেয়েলি ব্যাপার আছে। তাকে ঘিরে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতা আছে। আমি অল্প কিছু মানুষের ভেতর এই বিষয়টি দেখেছি।

শফিক আমাকে বসিয়ে রেখেই নীলহাতি'র গল্প পড়ে ফেলল। ছয়-সাত পাতার গল্প, বেশি সময় লাগার কথা না। গল্প শেষ করে গম্ভীর গলায় অতি প্রশংসাসূচক একটি বাক্য বলল। প্রিয় পাঠক, এই বাক্যটি উপন্যাসে ব্যবহার করতে আমার লজ্জা লাগছে। তারপরেও ব্যবহার করছি। শফিক বলল, আপনি যে অনেক বড় একজন গল্পকার, গ্রীম ব্রাদার্সদের মতো, তা কি আপনি জানেন?

আমি হেসে ফেলে বললাম, জানি। দেশের মানুষ তো জানে না।

আমি বললাম, একদিন হয়তো জানবে। আবার হয়তো জানবে না। আমাদের নিয়ন্ত্রণ তো আমাদের হাতে নেই। অন্য কারও হাতে। আমরা পুতুলের মতো নাচছি। সবই 'পুতুল নাচের ইতিকথা।

আপনি অদৃষ্টবাদী?

হ্যাঁ।

মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরেছেন?

হ্যাঁ।

কতবার?

একবার।

আরও দু'বার মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরবেন। তাই নিয়ম।

আমি শফিকের কথায় যথেষ্টই আনন্দ পেলাম।

শফিক বলল, আমি নিজেও অদৃষ্টবাদী। তবে আপনাকে অদৃষ্টবাদী হলে চলবে না। বড় লেখকেরা জীবনবাদী হন। অদৃষ্টবাদী হন না।

দুপুরে শফিক আমাকে ছাড়ল না। তার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে হলো। রান্না করেছেন শফিকের মা। শফিক তাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। দ্রমহিলা নির্বাক-প্রকৃতির। ছেলের সঙ্গেও কথা বলেন না। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন।

শফিক বলল, মার ধারণা তিনি কুকুরের কথা বুঝতে পারেন। তাঁর একটা কুকুর ছিল, নাম 'কপালপোড়া'। মা ওই কুকুরের সঙ্গে কথা বলতেন। এখন আমার কুকুরের সঙ্গে কথা বলেন।

আপনার কুকুর আছে নাকি?

হ্যাঁ আছে। নাম দিয়েছি কালাপাহাড়।

শফিকের আদর্শলিপি প্রেসে ওইদিন দুপুরের খাবারের কথা আমার বাকি জীবন মনে থাকবে। কারণ ওইদিন শফিকের মায়ের রান্না করা অদ্ভুত এক খাবার খেয়েছিলাম—আমের মুকুল দিয়ে মৌরলা (মলা) মাছ। অনেককেই এই খাবার তৈরি করে দিতে বলেছি। কেউ রেসিপি জানে না বলে তৈরি করে দেয় নি। শফিকের মাও দ্বিতীয়বার এই খাবার রান্না করেন নি। তিনি আসলে সিজিওফ্রেনিয়ার রোগী ছিলেন। মাঝে মাঝে তার রোগের প্রকোপ বেড়ে যেত। তখন তিনি দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। সারাক্ষণ অদৃশ্য এক কুকুরের সঙ্গে কথা বলতেন। শফিক তাকে ডাকলে কুকুরের মতোই শব্দ করতেন। এই মহিলার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের এক চিকিৎসক। আমি তার নাম ভুলে গেছি। এই চিকিৎসক শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ক্যানসারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তার মৃত্যু তরান্বিত করেছিলেন।

শফিকের কারণে আরও দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। একজন তার পোষা কুকুর কালাপাহাড়। তার গা-ভর্তি ভেড়ার লোমের মতো বড় বড় ঘন কালো লোম। প্রকাণ্ড শরীর। পুতি পুতি লাল চোখ।

কালাপাহাড় আমাকে দেখেই চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু করল। শফিক বলল, চুপ! কালাপাহাড় চুপ। উনি আমার বন্ধু মানুষ। তাকে দেখে এ রকম শব্দ করা যাবে না। উনি ভয় পেতে পারেন। তুমি যাও তাঁর পায়ের কাছে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থাকো।

আমাকে অবাক করে দিয়ে এই কুকুর আমার দুই পায়ের কাছে এসে মাথা নিচু করে বসল। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনার এই কুকুর কি মানুষের ভাষা বুঝতে পারে?

শফিক বলল, সবার কথা বুঝতে পারে না। তবে আমারটা মনে হয় পারে।

আমি বললাম, অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শফিক বলল, আমাদের ঘিরে আছে অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার। আমরা তা বুঝতে পারি না। এই প্রসঙ্গে এডগার এলেন পো'র একটি উক্তি আছে। উক্তিটি শুনেছেন?

আমি বললাম, না। বলুন শুনি।

শফিক বলল, বলব না। আপনি এলেন পো'র রচনা পাঠ করে জেনে নেবেন। আপনি লেখক মানুষ। আপনার প্রচুর পড়াশোনা করা প্রয়োজন।

শফিকের কারণে দ্বিতীয় যার সঙ্গে পরিচয় হলো সে এক _____ অবন্তি। আমি এমন রূপবতী মেয়ে আগে কখনো দেখি নি। ভবিষ্যতে দেখব এমন মনে হয় না। দুধে আলতা গায়ের রঙ বইপত্রেই শুধুই পড়েছি, এই প্রথম চোখে দেখলাম। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ নিয়ে দুজন এসেছিলেন, একজন হলেন ইংরেজ কবি শেলী। দ্বিতীয়জন হলেন বুদ্ধদেবপুত্র কুনাল। আমি নিশ্চিত, অবন্তির চোখ ওই দুজনের চোখের চেয়েও শতগুণ সুন্দর।

মেয়েটার একটাই দোষ লক্ষ করলাম, সে কিছুক্ষণ পর পর ঠোঁট গোল করে ভুরু কুঁচকে বসে থাকে। তখন তাকে যথেষ্টই কুৎসত দেখায়। মনে হয় বিদেশি এক কুকুর বসে আছে। তার এই বাজে অভ্যাস কেউ শোধরানোর চেষ্টা কেন করে নি কে জানে।

শফিক বলল, আমার এই লেখকবন্ধুকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

অবন্তি বলল, আমি কোনো লেখককে এত কাছ থেকে কখনো দেখি নি। আচ্ছা আপনি কি হাত দেখতে পারেন?

আমি বললাম, না।

অবন্তি বলল, আপনি চমৎকার একটা সুযোগ মিস করলেন। আপনি যদি হ্যাঁ বলতেন তাহলে অনেকক্ষণ আমার হাত কচলাবার সুযোগ পেতেন।

আমি হেসে ফেললাম। অবন্তি বলল, আপনার সঙ্গে আজ গল্প করতে পারব। আমার প্রচণ্ড শরীর খারাপ।

শফিক বলল, তোমার কী হয়েছে?

অবন্তি অবলীলায় বলল, মাসের কয়েকটা দিন মেয়েদের শরীর খারাপ থাকে। আমার সেই শরীর খারাপ। এখন বুঝেছেন?

আমি ছোটখাটো ধাক্কার মতো খেলাম। কোনো মেয়ের কাছ থেকে নিজের শরীর খারাপ বিষয়ে এই ধরনের কথা শুনব তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

অবন্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার একুশ বছর পর আমি একটি উপন্যাস লিখি। উপন্যাসের নাম লীলাবতী। লীলাবতীর রূপ বর্ণনায় আমি অবন্তিকে চোখের সামনে রেখেছিলাম।

তারিখ নভেম্বর ২৪ (১৯৭৫)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বসে আছি। আনোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করছি। আজ আনোয়ার আমাকে কর্নেল তাহেরের কাছে নিয়ে যাবে। কর্নেল তাহের যে তখন পলাতক, এস এম হলে পদার্থবিদ্যার একজন লেকচারারের ঘরে লুকিয়ে আছেন, সেই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

দিনটা ছিল মেঘলা। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আনোয়ার আসতে দেরি করছে। আমি তৃতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছি। তখন ক্লাবের বেয়ারা এসে বলল, অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব আমাকে ডাকছেন। হ্যারল্ড লাসকির ছাত্র অধ্যাপক রাজ্জাক (পরে জাতীয় অধ্যাপক) তখন কিংবদন্তি মানুষ। তিনি আমাকে চেনেন এবং আমাকে ডাকছেন শুনে খুবই অবাক হলাম।

রাজ্জাক স্যারের সামনে দাঁড়াতেই বললেন, আসেন দাবা খেলি।

রাজ্জাক স্যার বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়। তার সঙ্গে কী খেলব। তারপরেও খেলতে বসলাম। খেলা কিছুদূর অগ্রসর হতেই আনোয়ার এসে উপস্থিত। আমি বললাম, আজ তো আর যেতে পারব না। স্যারের সঙ্গে খেলতে বসেছি।

আনোয়ার হতাশ মুখে বলল, বুঝতে পারছি।

দাবা খেলা সেদিন আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করল। আমি কর্নেল তাহেরের সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম না। জিয়াউর রহমানের নির্দেশে ওই দিনই দশ হাজার জাসদ কর্মীর সঙ্গে কর্নেল তাহের গ্রেফতার হলেন।

দশ হাজার জাসদকর্মীর সঙ্গে আদর্শলিপি প্রেসের শফিকও গ্রেফতার হয়। তার অপরাধ আদর্শলিপি প্রেস থেকে জাসদের প্রপাগান্ডা ছাপা হয়।

কর্নেল তাহেরকে মুক্ত করার জন্য দুদিন পর (২৬ নভেম্বর) জাসদ এক সাহসী পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনার মূল বিষয় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপহরণ এবং পরে তার মুক্তির বিনিময়ে কর্নেল তাহেরের মুক্তি।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অভিযানের ছয় নায়কের মধ্যে চারজনই সমর সেনের নিরাপত্তাকর্মীর হাতে নিহত হন। চারজনের একজন হলেন কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই। নাম সাখাওয়াত হোসেন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতার জন্যে তাকে 'বীর প্রতীক' সম্মানে দু'বার সম্মানিত করা হয়েছিল।

মিথ্যা এক অভিযোগ আনা হলো কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে। তিনি নাকি ১৯৭৫ সনের ৭ নভেম্বর এক বৈধ সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালান। হায়রে রাজনীতি!

মহাবীর কর্নেল তাহেরের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। তারপরেও সামান্য দিচ্ছি।

১৪ নভেম্বর ১৯৩৮ সনে জন্ম। বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ, মা আশরাফুন্নিসা।

সিলেটের এমসি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের দুর্গাপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এম. এ. প্রথম পর্ব সমাপ্ত। সেনাবাহিনীতে যোগদান। পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্টে কমিশন লাভ।

১৯৬৫ সনে কাশ্মীর রণাঙ্গণে যুদ্ধে কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রানে পড়ার সুযোগ পান। সেখানকার স্পেশাল অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর সনদে লেখা ছিল—এই যোদ্ধা পৃথিবীর যে-কোনো সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যেকোনো অবস্থায় কাজ করতে সক্ষম।

তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বীর উত্তম’ পান।

১৪ নভেম্বর ঠিক তার জন্মদিনেই কামালপুর অভিযানে গোলার আঘাতে বাম পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সবাই ধরে নেয় তিনি মারা যাচ্ছেন।

১৯. অবন্তিকে লেখা হাফেজ জাহাঙ্গীরের চিঠি

অবন্তিকে লেখা হাফেজ জাহাঙ্গীরের চিঠি–

পত্নী মায়মুনা,

আসসালামু আলায়কুম।

পর সমাচার এই যে, আমি বাতেনি পদ্ধতিতে সংবাদ পেয়েছি যে, তোমার দাদাজান ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহপাক তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন বিধায় উনি সম্মানিত স্থানে অবস্থান করছেন।

আমার এই জাতীয় কথাবার্তায় তোমার বিশ্বাস নাই, তা আমি জানি। তোমার বিশ্বাস আনার চেষ্টাও আমি করব না। তবে একটি বিষয় তোমাকে জানাতে চাই—আমি নবি-একরিমের (দঃ) একটি সুন্নত সারা জীবন পালন করেছি। তা হলো মিথ্যা না বলা। আমার একার চেষ্টায় তা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহপাকের অসীম করুণায় সম্ভব হয়েছে।

কাতল মাছে বিষ মিশানোর বিষয়ে তুমি আমাকে কঠিন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে। তোমার অভিযোগ ছিল বিষ মিশানোর বিষয়টি মিথ্যা। আমি দরবারশরিফের ভাব উজ্জ্বল করার জন্যে মিথ্যাচার করেছি। মায়মুনা! তোমার অভিযোগ শুনে আমি মনে কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু তর্কে যাই নাই। আমি তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করি না।

আল্লাহপাক আমাকে অভিযোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। ভৈরবের যে বাবুর্চি এই কাজ করেছিল সে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করার জন্যে আমার কাছে এসেছিল। আমি দরবারশরিফের বাবুর্চি হিসাবে তাকে নিয়োগ দিয়েছি। কোনো-একদিন তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই দেখা হবে। তুমি ঘটনা বিস্তারিত জানবে।

মায়মুনা! তোমাকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখে মন অস্থির হয়ে ছিল। স্বপ্নের তাবীর’ বের করার পর অস্থিরতা কমেছে। আগে স্বপ্নটা বলি, তারপর তার তাবীর বলব।

শুক্লপক্ষের রাতে ফজরের আজানের আগে আগে স্বপ্নটা দেখি। স্বপ্নে তুমি হুজরাখানায় মুসুল্লিদের উদ্দেশে কী যেন বলছ। মুসুল্লিরা আগ্রহ নিয়ে তোমার কথা শুনছেন। মুসুল্লিদের মধ্যে আমিও আছি। আমি অবাক হয়ে দেখছি, তুমি সম্পূর্ণ নগ্নগাত্র। শরীরে একটা সুতাও নাই।

এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে অস্থির হওয়াটা স্বাভাবিক। আমি অল্প সময়ে স্বপ্নের তাবীর বের করে মনে প্রভূত শান্তি পেয়েছি।

স্বপ্নের তাবীর হলো—পোশাক মানুষের আবরণ। পোশাক মানুষকে ঢেকে রাখে। পোশাক হলো পর্দা। তুমি সবার সামনে উপস্থিত হয়েছ পর্দা ছাড়া। অর্থাৎ তুমি কোনোরকম ভনিতা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করেছ। আলহামদুলিল্লাহ।

বাতেনি জগতে সংবাদ আদানপ্রদান হয় প্রতীকের মাধ্যমে। এইসব প্রতীকের ব্যাখ্যা জটিল হয়ে থাকে। আমার জানামতে একমাত্র বড় পীর সাহেবই প্রতীকের নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

মায়মুনা! বাতেনি জগতের নানান বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করার আমার শখ ছিল। যেমন, মানুষের বেলায়েতি ক্ষমতা। যা আমার পিতার ছিল, আমার নাই। তোমাকে আমার সঙ্গে জোর করে বিবাহ দিবার কারণে তুমি উনার প্রতি নারাজ। মুখে তুমি কোনোদিন কিছু না বললেও আমি তা বুঝতে পারি।

মায়মুনা! আমার পিতার উপর থেকে তুমি নারাজি ভাব দূর করো। উনার মতো জ্ঞানী মানুষ আমি দেখি নাই। উনি হাদিস, তফছির, ফেকাহ, মন্তেক, হেকমত, বালাগত, উছুল, আকায়েদ এবং ফরায়েজ জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। উনি চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। তোমার ভবিষ্যতও উনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন।

দরবারশরিফে জ্বিনের আগমন এবং জ্বিন কর্তৃক দোয়াপাঠের কার্যক্রম তিনি শুরু করেছিলেন। আমি জানি এই বিষয়ে অনেকের মতো তোমার মনেও সন্দেহ আছে। এই বিষয়ে আমার পিতার কী বক্তব্য তা তোমাকে জানাতে ইচ্ছা করি। উনাকে জ্বিন-বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করা হলে উনি মহাকবি খসরুর একটি শায়ের পাঠ করতেন। শায়েরটি হলো—

‘খল্ক মি গোয়েদ কে খসরু ভুল পুরস্তি মিকুনদ আরে আরে মিকুম বা খলকে আলম কার নিস্ত।’

এর অর্থ ‘লোকে বলে খসরু ভূতের পূজা করে। সত্যই। আমি তা-ই করি। ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।‘

প্রিয় মায়মুনা! আমার ধারণা আমার পিতারও কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। যেমন, হুজরাখানায় জ্বিনের আগমন। জ্বিন কর্তৃক মিলাদ পাঠ। জ্বিনের আগমন এবং মিলাদ পাঠ যে ভুয়া তা আমি অল্পবয়সেই ধরতে পারি। আকিকুন্নিসা নামের এক খর্বাকৃতি কুদর্শন তরুণী (মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রী) পাঞ্জাবি পরিধান করে জ্বিন সেজে লাফালাফি করত। শূন্যে লাফ দেওয়ার তার অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। দূর থেকে দেখলে মনে হতো সে শূন্যে ভাসছে।

পিতার মৃত্যুর পর আমি জ্বিন আনা খেলা বন্ধ করেছি। তবে মায়মুনা, জ্বিন অস্বীকার করবে না। পবিত্র কোরানশরিফে অনেকবার জ্বিনের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরানশরিফে জ্বিন নামে একটি সূরাও আছে। আমি আমার জীবনে দুইবার জ্বিনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। জাত হিসাবে এরা উগ্র এবং খানিকটা নির্বোধ। তোমার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে এই বিষয়ে বলব ইনশাল্লাহ।

তোমাকে অতি দীর্ঘ পত্র লিখলাম, কারণ আমার মন দুর্বল। মন দুর্বল অবস্থায় মানুষ বাচাল হয়। চিঠিপত্রেও বাচালতা প্রকাশ পায়। আমার দুর্বল মনের কারণ হলো—আমি অসুস্থ। প্রচণ্ড কাশি হয়। কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত যায়। আমার ধারণা যক্ষা। আমি কোনো চিকিৎসা নিচ্ছি না। আল্লাহপাকের কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছি। আল্লাহ শাফি। আল্লাহ কাফি।

ইতি
হাফেজ জাহাঙ্গীর।

দীর্ঘ চিঠির অতি সংক্ষিপ্ত জবাব অবন্তি পাঠাল। তার চিঠি–

হাফেজ সাহেব,

আমার বাবা ঘোর নাস্তিক। তিনি কোনোকিছুই বিশ্বাস করেন না। তবে মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের বিশাল অর্জন। আপনি চিকিৎসা নেবেন, আপনার প্রতি এই আমার অনুরোধ। আরেকটা কথা, মায়মুনা সম্বাোধনে কখনোই আমাকে চিঠি লিখবেন না। আমি মায়মুনা না, আমি অবন্তি।

ইতি
অবন্তি।

হাফেজ জাহাঙ্গীরের চিঠি পোস্ট করার এক ঘন্টার মধ্যে অবন্তি তার ঘোর নাস্তিক বাবার এক আস্তিক পত্র পেল। তার চিঠিটি এই–

মা অবন্তি
কুটকুট, ভুটভুট, মুটমুট।

তোমার মায়ের সেবাযত্ন এবং মুখের কঠিন বাক্যবাণে আমার শরীর অনেকখানি সেরেছে। ডাক্তার বলেছে, লিভার ফাংশন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ডাক্তার অবাক, আমিও অবাক। আমি ভেবেছিলাম শেষটায় লিভার সিরোসিস হবে। তারপর মহান মৃত্যু। বন্ধু

খালেদ মোশাররফ গিয়েছে যেই পথে, আমিও যাব সেই পথে। তার মৃত্যু হয়েছে গুলি খেয়ে। আমার মৃত্যু হবে সিরোসিস খেয়ে।

কয়েকদিন আগে শুনলাম কর্নেল তাহেরও বন্দি। ব্যাপারটা কী? কর্নেল তাহেরের পরিবারের কাছে বাংলাদেশ ঋণী। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে আমার মনে করায় কিছু আসে যায় না। দেশের আমজনতা কী ভাবছে তাতেও কিছু যায় আসে না। শুধু যায় আসে রাষ্ট্রচালকেরা কী ভাবছেন। তবে তাদের ভাবনা রাজনৈতিক ভাবনা। এই ভাবনার সঙ্গে আমরা কেউ যুক্ত না। যাক রাজনীতি, অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি।

গত বুধবার সকালে তোমার মা প্লেটে করে আমাকে সাত রকমের ফল কেটে দিল। সে নিউট্রিশনের কোনো-এক ম্যাগাজিনে পড়েছে যে প্রতিদিন সাত রকমের ফল খায় তাকে কোনো রোগব্যাধি স্পর্শ করে না। যে সাত রকমের ফল আমাকে দেওয়া হলো তার তালিকা

একটি আপেল।

পাঁচটা লাল আঙুর।

একটি কমলা।

একটি কিউই।

একটি পীচ।

এক ফালি আনারস।

এক ফালি গুয়ানা বানা (গুয়েতেমালার ফল)।

ফলগুলির দিকে তাকিয়ে তোমার নাস্তিক বাবার মাথায় আস্তিক এক চিন্তা এসেছে। সেই চিন্তাটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করি।

এই সুমিষ্ট ফলগুলি ফলদায়িনী গাছের বংশবিস্তার ছাড়া কোনো কাজে আসছে না। ফলগুলির লক্ষ্য মানুষ এবং পাখি। পশুরা ফল পছন্দ করে না। গাছেরা কি জানে এই ফল সে কেন দিচ্ছে? অবশ্যই জানে না। তাহলে অন্য কেউ জানে। যার ইশারায় ঘটনা ঘটছে। পৃথিবীতে পাখি ও মানুষের আসার আগেই ফলদায়িনী বৃক্ষরাজি এসেছে। অর্থাৎ কেউ একজন পাখি ও মানুষের আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

মা শোনো, এখন আমার মাথায় বই লেখার এক চিন্তা এসেছে। বইয়ের নাম An Atheist's God। বইয়ের প্রথম লাইন লিখে ফেলেছি। যে-কোনো গ্রন্থের প্রথম লাইন লেখাটাই সবচেয়ে দুরূহ কর্ম। প্রথম লাইনটি হলো—Every creation started from zero, is it so?

ইতি তোমার বাবা
নাস্তিক নাম্বার ওয়ান
আস্তিক নাম্বার ওয়ান।

হাফেজ জাহাঙ্গীর অবন্তির চিঠির নির্দেশের কারণেই ময়মনসিংহে ডাক্তার দেখাতে গেলেন। অল্পবয়সী ডাক্তার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, মওলানা সাহেব, আপনার জন্যে একটি দুঃসংবাদ আছে।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, আমার কি টিবি হয়েছে?

ডাক্তার বললেন, টিবি হওয়া কোনো দুঃসংবাদ না। টিবির চিকিৎসা আছে। আমার ধারণা আপনার ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছে।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, ক্যানসারের কি চিকিৎসা নাই?

ডাক্তার বললেন, আছে। সেই চিকিৎসা ফুসফুস ক্যানসারে প্রায়শই কাজ করে না। আপনি ঢাকায় যান, ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান।

হাফেজ জাহাঙ্গীর ঢাকায় গেলেন না। হুজরাখানায় ফিরে এলেন। তাকে খুব বিচলিত মনে হলো না। হুজরাখানার কাজকর্ম আগের মতোই চলতে লাগল। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের শেষে বিশেষ এক দোয়ায় তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছ তা-ই আমার জন্যে যথেষ্ট।

এই সময়ে হাফেজ জাহাঙ্গীরকে নিয়ে কিছু গল্প গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একটি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে।

কার্তিক নামের মধ্যবয়স্ক মানুষ। পেশায় স্বর্ণকার। সে ঢাকায় যায় স্বর্ণ কিনতে। তার সঙ্গে আঠার হাজার টাকা। সে পড়ে ছিনতাইকারীদের হাতে। তার সর্বস্ব খোয়া যায়। ছিনতাইকারীরা তার তলপেটে ছোরা মেরে তাকে রাস্তার পাশে নর্দমায় ফেলে যায়।

কার্তিক তলপেটে হাত রেখে বলতে থাকে, বাবা হাফেজ জাহাঙ্গীর, আমাকে বাঁচান। এই সময় সে দেখে হাফেজ জাহাঙ্গীর তার পাশে দাঁড়ানো। হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, চোখ বন্ধ করে আমার হাত ধরেন। কার্তিক তা-ই করল। একসময় হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, চোখ মেলুন।

কার্তিক চোখ মেলে দেখে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সির বারান্দায় শোয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চিকিৎসা শুরু হয়। এগার দিনের মাথায় সে সুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে এই গল্প জনে জনে বলতে শুরু করে।

এক বিষুদবার রাতে হাফেজ জাহাঙ্গীর কার্তিককে ডেকে পাঠালেন।

কার্তিক এসে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করল। হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, আপনি যে গল্পটা জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন, গল্পটা কি সত্যি?

কার্তিক বলল, যদি সত্যি না হয় তাহলে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। আমি যেন নির্বংশ হই।

হাফেজ জাহাঙ্গীর বললেন, এমন কঠিন শপথে যাবেন না। আপনার গল্প সত্যি না। সত্যি হলে আমি জানতাম। আপনি প্রবল ঘোরের মধ্যে আমাকে দেখেছেন। অন্য কেউ আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। আমি না।

কার্তিক বলল, আপনি আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। আমার যে হাত আপনি ধরেছিলেন সেই হাতে এখনো আতরের গন্ধ। বাবা! আপনি আমার হাত তাঁকে দেখেন।

হাফেজ জাহাঙ্গীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মানবজাতির স্বভাব হচ্ছে সে সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

২০. শফিক এবং সিআইডি ইন্সপেক্টর শেখ হাসানুজ্জামান খান

শফিক এবং সিআইডি ইন্সপেক্টর শেখ হাসানুজ্জামান খান।

স্থান : পুলিশ হেডকোয়ার্টার, রাজারবাগ। তারিখ ২৭ নভেম্বর। সময় সন্ধ্যা সাতটা।

শফিকের চোখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফাঁসির সময় যে ধরনের কালো টুপি আসামিকে পরানো হয়, সেরকম একটা টুপি শফিককে পরানো। শফিকের কেমন অদ্ভুত লাগছে। সে নানান ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই কি এত শব্দ? ঘুঘু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিশ্চয়ই ঘুঘু বাসা বাঁধবে না।

আপনার নাম?

শফিক।

শুধু শফিক? আগে পেছনে কিছু নেই। মোহাম্মদ কিংবা আহমেদ।

পেছনে আহমেদ আছে স্যার, শফিক আহমেদ।

প্রশ্ন করলে এমনভাবে জবাব দেবেন যেন দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করতে না হয়। আমার সময় তেমন মূল্যবান না, তারপরেও সময় নষ্ট করবেন না।

জি আচ্ছা।

টেবিলে আলপিন দেখতে পাচ্ছেন?

জি-না, পাচ্ছি না। আমার চোখ বন্ধ।

চোখের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছি। এখন বলুন, কয়টা আলপিন?

একজন পেছন থেকে শফিকের মাথার টুপি সরিয়ে দিল। শফিকের চোখে ধাঁধা লেগেছে। মনে হচ্ছে ঘরে সার্চলাইট জ্বলছে। সে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, স্যার, নয়টা আলপিন।

ভালোমতো শুনে বলুন। স্যার দশটা।

কোনো প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিলে একটা আলপিন নখের নিচে এক ইঞ্চির মতো ঢুকিয়ে দেব। দশটা ভুল উত্তর দেবেন, দশ আঙুলে দশটা আলপিন নিয়ে হাজতে ফিরে যাবেন। বুঝতে পারছেন?

জি স্যার।

কর্নেল তাহেরকে চেনেন?

জি-না।

নাম শুনেছেন।

জি-না।

কর্নেল তাহেরের কোনো আত্মীয়স্বজনকে চেনেন?

জি-না।

আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়?

নেত্রকোনা। কেন্দুয়া থানা।

পূর্বধলার নাম শুনেছেন?

জি।

পূর্বধলার কাজলা গ্রামে কখনো গিয়েছেন?

জি-না।

আপনি পাঁচটা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন। প্রথম ভুল উত্তর হলো—আপনি কর্নেল তাহেরকে চেনেন না বলেছেন।

স্যার চিনি, তবে পরিচয় নাই।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি কোন পা হারিয়েছেন?

বাম পা।

আপনি তো তাকে ভালোমতোই চেনেন। ভালোমতো না চিনলে বলতে পারতেন না কোন পা। কর্নেল তাহেরের এক ভাই আনোয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁকে চেনেন?

জি-না। আনোয়ারের নাম এই প্রথম শুনলাম।

উনি দু'বার আপনার প্রেসে এসেছিলেন। একবার রাতে আপনার সঙ্গে থেকেও গিয়েছিলেন। আপনি বললেন, আনোয়ার নাম এই প্রথম শুনলাম।

এখন থেকে আর মিথ্যা বলব না স্যার। সত্য বলব। আনোয়ার আমার বন্ধু মানুষ। আমি ইউনিভার্সিটিতে ম্যাথমেটিকসে আবার ভর্তি হতে চাই। আনোয়ার

এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করছে।

আমি এখন আপনার ডান হাতের তর্জনীতে একটা আলপিন ঢুকাব। আবার কিছু প্রশ্ন করব। আমার ধারণা তখন সত্য উত্তর পাব।

স্যার, আলপিন ঢুকাতে হবে না। এখন থেকে আমি সত্য কথা বলব। একটাও মিথ্যা বলব না। কর্নেল তাহেরের পরিবারের সঙ্গে আমি ভালোমতো পরিচিত। পূর্বধলার কাজলা গ্রামে আমার নানার বাড়ি। কর্নেল তাহেরের পরিবারের কাছে আমার নানাজানের পরিবার

নানানভাবে ঋণী। কর্নেল তাহেরের মায়ের নাম বেগম আশরাফুন্নিসা। তার এক বোনের নাম...।

স্টপ।

স্যার আমি স্টপ করব না। কর্নেল তাহেরের মা'কে আমিও মা ডাকি। কর্নেল তাহেরের এক বোনের নাম শেলী...।

[প্রশ্নোত্তর বন্ধ। আচমকা শফিকের তর্জনীতে আলপিন ফুটানো হয়েছে। শফিক শুরুতে একটা বিকট চিৎকার দিল। তারপর পশুর মতো গোঙাতে লাগল।]

ব্যথা পেয়েছেন? [উত্তর নেই। চাপা গোঙানি।]

রাজসাক্ষী হবেন? কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হচ্ছে সেখানে সাক্ষ্য দেবেন। আপনাকে কী বলতে হবে তা শিখিয়ে দেব।

এই কাজ আমি কখনোই করব না।

বুড়ো আঙুলে আরেকটা আলপিন ঢুকানো হলে আনন্দের সঙ্গে রাজসাক্ষী হবেন।

আমি রাজি হব না। আঙুলে ঢোকান।

[আবারও আর্তচিৎকার। আবারও গোঙানি।]

রাজসাক্ষী হবেন?

না। আরও আলপিন ঢোকাতে চাইলে ঢোকাতে পারেন। আমি আর যা-ই হই, মীরজাফর হব না।

আপনার সাহস দেখে ভালো লাগল।

আমি মোটেই সাহসী মানুষ না। আমি ভীতু। তবে মাঝে মাঝে সময় ভীতুদের সাহসী করে তোলে।

সুন্দর কথা বলেছেন।

কথাটা আমার না স্যার। পুশকিনের। আলেকজান্ডার পুশকিন। স্যার, আপনি কি পুশকিনের নাম শুনেছেন?

পুলিশে চাকরি করলেই মানুষ মূখ হয় না। আমি পুশকিনের লেখা ক্যাপ্টেনের মেয়ে’ বইটা পড়েছি।

স্যার, আপনি কি তুর্গেনিভ পড়েছেন।

আমরা এখানে সাহিত্য আলোচনায় বসি নি।

তুর্গেনিতের একটি উপন্যাসে আমার এখন যে অবস্থা তার নিখুঁত বর্ণনা আছে। সেখানে জারের পুলিশ কমিশনার একপর্যায়ে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। বন্দিকে এক পেয়ালা কফি আর একটা মাখন মাখানো টোস্ট খেতে দেন।

আপনি কি টোস্ট এবং কফি খেতে চান?

না।

চা খান, চা দিতে বলি?

জি-না স্যার।

আপনি যে উপন্যাসটির কথা বলছেন সেখানে গরম কফি এবং মাখন লাগানো টোস্ট খাইয়ে বন্দিকে বরফের মধ্যে খালি পায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে জারের পুলিশরা গুলি করে মারে।

স্যার, আপনি অনেক পড়াশোনা জানা মানুষ। আপনি আমাকে যে শারীরিক কষ্ট দিলেন তার জন্যে আপনাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

[সিআইডি ইন্সপেক্টর শেখ হাসানুজ্জামান খান হো হো করে হেসে উঠলেন। তবে এই মানুষটির একক চেষ্টায় ডিসেম্বরের চার তারিখ শফিক পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পায়। কাকতালীয়ভাবেই ডিসেম্বরের চার তারিখ শফিকের জন্মদিন।]

মুক্তি পাওয়া শফিক কিছু অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করে। যেমন, এক ছড়া কলা কিনে সর্বসাধারণে কলা বিতরণ। কলা বিতরণ শেষে সে তার মাকে দেখার জন্যে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়ে। ট্রেন চালু হওয়ামাত্র মনে পড়ে যে তার মা ঢাকায়, আদর্শলিপি প্রেসের দোতলায় থাকেন।

ক্লান্ত শফিক ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করে না। সে ট্রেনের জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এক কামরায় সে বসে আছে। তার সামনে একটা খালি কাঠের কালো রঙের চেয়ার। চেয়ারের হাতলে ঘুঘু পাখি বাসা বেঁধেছে। মা ঘুঘু তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে বসে আছে। বাচ্চা দুটি কাঁদছে। মা ঘুঘু ইংরেজিতে বলছে, Baby do not cry.

শফিকের মা আদর্শলিপি প্রেসের দোতলায় নেই। তিনি আছেন অবন্তিদের বাড়িতে। শফিকের গ্রেফতার হওয়ার পর প্রেসের লোকজনই তাঁকে এই বাড়িতে রেখে গেছে। অবন্তি তাকে নিজের শোবার ঘরে রেখেছে। তার জন্যে আলাদা খাট পাতা হয়েছে। শফিকের মা অবন্তিকে ডাকেন নীলু। নীলু তার একমাত্র মেয়ে যে সাত বছর বয়সে পুকুরে ডুবে মারা গেছে।

অবন্তি তার নতুন নামকরণ সহজভাবেই নিয়েছে। তাকে নীলু ডাকলে সে সহজভাবেই বলে, জি খালা! কিছু লাগবে।

অবন্তিকে হতভম্ব করে রাত তিনটায় শফিক সত্যি সত্যি উপস্থিত হলো। অবন্তি মনে মনে বলল, Oh God! Oh God! Oh God!

সেই রাতেই অবন্তি তার মাকে দীর্ঘ চিঠি লিখল–

মা!

যতই দিন যাচ্ছে আমি ততই দিশাহারা হচ্ছি। আমি কখনোই অদৃষ্টবাদী ছিলাম না। এখন অদৃষ্টবাদী হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই বিশেষ একজনের খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছুই না। কেন তিনি আমাদের নিয়ে খেলছেন? আমি জানি না। আমার জানতে ইচ্ছা করে।

এই পর্যন্ত লিখেই অবন্তি চিঠি ছিঁড়ে কুচি কুচি করল। মাকে এই ধরনের চিঠি লেখা অর্থহীন। তার নর্তকী মা বিষয়টা বুঝবেন না। তার মা'র জগৎ আলো ঝলমল গানবাজনা এবং নৃত্যের জগৎ। সাত কোর্স লাঞ্চ, এগার কোর্সের ডিনারের জগৎ। ডিনারের আগে তিনি ওয়াইন গ্লাসে রেডওয়াইন ঢালবেন, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলবেন, বাহ্ এই ড্রাই ওয়াইনের কী চমৎকার ফুটি ফ্লেভার! আনন্দে তার মুখ ঝলমল করে উঠবে। এতে দূষনীয় কিছু নেই। সব মানুষের আনন্দ আহরণ প্রক্রিয়া এক না।

দরজায় ধাক্কার শব্দে অবন্তি চমকে ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত একটা পঁচিশ বাজে। এত রাতে কে তার দরজায় ধাক্কাচ্ছে। বাড়িতে মানুষ বলতে আর একজন আছে, শফিক স্যার। তিনি এত রাতে কেন দরজা ধাক্কাবেন। কোনো সমস্যা।

অবন্তি দরজা খুলল। শফিক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পারকিনসন্স রোগীর মতো তার হাত কাঁপছে। অবন্তি বলল, স্যার, কোনো সমস্যা?

শফিক বলল, তুমি সদর দরজা লাগিয়ে দাও, আমি বাইরে যাচ্ছি।

এত রাতে বাইরে যাচ্ছেন মানে? কোথায় যাচ্ছেন?

শফিক বিড়বিড় করে বলল, চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকব। আমার খুব অস্থির লাগছে। মাথার ভেতর পাগলাঘণ্টি বাজতে শুরু করেছে। এখন আস্তে বাজছে। পরে জোরে বাজবে।

অবন্তি বলল, আপনার সব কথা হেঁয়ালির মতো লাগছে। কী ঘটনা পরিষ্কার করে বলুন।

শফিক বলল, জেলখানায় আমি একবার পাগলাঘণ্টি শুনেছিলাম। এই ঘণ্টি আবার বাজছে। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে।

অবন্তি বলল, আপনি চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকলে কি ঘন্টা বাজা বন্ধ হবে।

শফিক বলল, তা জানি না, তবে শরীরের জ্বলুনি কমবে।

শরীরের জ্বলুনি কমবে তা কীভাবে বুঝলেন?

শফিক বলল, আকাশে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বলুনি কমবে।

অবন্তি বলল, বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলে বাড়ির ছাদে চলে যান। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে হবে কেন?

শফিক ক্লান্ত গলায় বলল, সেখানে আমার সঙ্গে কালাপাহাড় থাকবে। সে আমাকে ঘিরে চক্কর দিবে। অবন্তি, আমি যাই?

অবন্তি বলল, যান। বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়া বাধিয়ে ফিরে আসুন। আপনার মা যেমন মানসিক রোগী, আপনিও তা-ই। আপনাদের দু'জনেরই ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন।

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শফিক শুয়ে আছে। সে আছে আধো ঘুম আধো জাগরণে। তার গায়ে বৃষ্টি পড়ছে কি পড়ছে না, তাও সে জানে না।

কালাপাহাড় তাকে ঘিরে সত্যি সত্যি পাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘরর' শব্দ করছে। কালাপাহাড় যতবার এই ধরনের শব্দ করছে ততবারই শফিক মাথা তুলে বলছে—চুপ করে থাক। কোনো কথা না।

ছাদে প্রাস্টিকের চেয়ারে অবন্তি বসে আছে। সেও ভিজছে। অবন্তি ঠিক করল সারা রাত যদি বৃষ্টি হয় সে সারা রাতই ছাদের চেয়ারে বসে ভিজবে।

২১. প্রহসনের এক বিচার

প্রহসনের এক বিচার শুরু হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। মামলার নাম রাষ্ট্র বনাম মেজর জলিল গং'। কর্নেল তাহেরসহ অভিযুক্ত সর্বমোট ৩৩ জন। এর মধ্যে রহস্যমানব হিসেবে খ্যাত সিরাজুল আলম খান পলাতক।

মামলার প্রধান বিচারকের নাম কর্নেল ইউসুফ হায়দার। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা এই বাঙালি অফিসার বাংলাদেশেই ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খেদমত করে গেছেন।

মামলা চলাকালীন একপর্যায়ে কর্নেল তাহের প্রধান বিচারকের দিকে তাকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, আমি আমার জীবনে অনেক ক্ষুদ্র মানুষ দেখেছি, আপনার মতো ক্ষুদ্র মানুষ দেখি নি। কর্নেল তাহেরের বক্তব্য শুনে আদালতে হাসির হল্লা ওঠে।

কর্নেল তাহের তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কিছু অভিযোগ অস্বীকার করেন নি। যেমন, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা।

অভিযুক্ত আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগেই দেওয়া হয় নি। ১৭ জুলাই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

সবাই ধরে নেয় এই আদেশ কখনোই কার্যকর হবে না।

'বীর উত্তম' খেতাবধারী একজন সেক্টর কমান্ডার, যিনি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পা হারিয়েছেন, তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানো যায় না। রায় ঘোষণার পরদিনই ফাঁসির মঞ্চ ঠিকঠাক করা শুরু হয়। খবর শুনে হতভম্ব তাহেরপত্নী লুফা প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। কর্নেল তাহের প্রাণভিক্ষার আবেদনে রাজি হবেন না তা লুৎফা তাহের ভালোমতোই জানতেন। ২০ জুলাই ক্ষমার আবেদন নাকচ করা হয়। পরদিনই তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

সাংবাদিক লিফসুলজের বিখ্যাত গ্রন্থ Bangladeh The Unfinished Revolution গ্রন্থে লুফা তাহেরের একটি চিঠি আছে। এই চিঠিতে তিনি কর্নেল তাহেরের জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার মর্মভেদী বর্ণনা দেন। এই চিঠি পড়ে অশ্রুরোধ করা কোনো বাংলাদেশি মানুষের পক্ষেই সম্ভব না।

২০ জুলাই ১৯৭৬ বিকেলে তাহেরকে জানানো হয় যে, ২১ তারিখ সকালে তার মৃত্যুর দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে। তিনি তাদের সংবাদ গ্রহণ করেন এবং সংবাদ বাহকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি তার রাতের ডিনার শেষ করেন, পরে একজন মৌলভীকে আনা হয়। সে এসে তাকে তার পাপের জন্যে ক্ষমা চাইতে বলে। তাহের বলেন, "তোমাদের সমাজের পাপাচার আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। আমি কখনো কোনো পাপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমি নিষ্পাপ। তুমি এখন যেতে পার। আমি ঘুমাব।' তিনি একেবারে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলেন। রাত তিনটার দিকে তাকে জাগানো হলো। কতক্ষণ সময় বাকি আছে, জিজ্ঞেস করে সে জেনে নিল। সময়টা জেনে নিয়ে তিনি তার দাঁত মাজলেন। তারপর সেভ করে গোসল করলেন। উপস্থিত

সকলেই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল। সকলকে মানা করে দিয়ে তিনি বললেন, ‘আমি আমার পবিত্র শরীরে তোমাদের হাত লাগাতে চাই না। তার গোসলের পর অন্যদের তিনি তার চা তৈরি করতে ও আমাদের প্রেরিত আম কেটে দিতে বললেন। তিনি নিজেই তাঁর কৃত্রিম পা-খানি লাগিয়ে প্যান্ট, জুতা ইত্যাদি পরে নিলেন। তিনি একটি চমৎকার শার্ট পরে নিলেন। ঘড়িটা হাতে দিয়ে সুন্দর করে মাথার চুল আঁচড়ে নিলেন। তারপরে উপস্থিত সকলের সামনে তিনি আম খেলেন, চা পান করলেন এবং সিগারেট টানলেন। তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘হাসো। তোমরা এমন মনমরা হয়ে পড়েছ কেন? মৃত্যুর চেহারায় আমি হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু আমাকে পরাভূত করতে পারে না। তার কোনো ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যুর বদলে, আমি সাধারণ মানুষের শান্তি কামনা করছি। এরপর তাহের জিজ্ঞেস করেন, ‘আরও কি কিছু সময় বাকি আছে? তারা উত্তর দিল, সামান্য বাকি।’ তিনি তখন বললেন, তাহলে আমি তোমাদের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাব।’ তিনি তখন তার কর্তব্য আর অনুভূতির উপর একটি কবিতা পাঠ করে শোনালেন। তারপর তিনি বললেন, ঠিক আছে, এবার আমি প্রস্তুত। সামনে চলো। তোমরা তোমাদের কাজ সমাধান করো।’ তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে দড়িটা তার গলায় নিজেই পরে নিলেন এবং তিনি বললেন, ‘বিদায় দেশবাসী। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।’

মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী এবং মহাবীর ভাইদের উদ্দেশে বলেন, ‘এইভাবে যদি জীবনকে উৎসর্গ করা না যায় তাহলে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে কীভাবে?’

রাষ্ট্রীয় হত্যার দীর্ঘ ৩৫ বছর পর হাইকোর্টে এক রীট পিটিশন করা হয়। পিটিশনে বলা হয় কর্নেল তাহেরের বিচার ছিল অবৈধ।

হাইকোর্ট রীট পিটিশন আমলে নিয়ে ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। মহামান্য বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী তার রায়ে বলেন (২২ মার্চ, ২০১১), তাহের এবং তার সহযোগীদের বিচার অবৈধ। তাহেরকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে।

জেনারেল জিয়াকে তাহের হত্যাকান্ত্রে জন্যে দায়ী করা হয়। রায়ে বলা হয়, জেনারেল জিয়া বেঁচে থাকলে তাহের হত্যাকাণ্ডের জন্যে তার বিচার হতো। বাংলাদেশের আইনে মৃত অপরাধীদের বিচারের বিধান নেই।

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. অবন্তির মা'র লেখা চিঠি

অবন্তির মা'র লেখা চিঠি।

হ্যালো সুইটি পাই,

মা, আমি কি তোমাকে গত মাসে চিঠি দিয়েছি? কেন জানি মনে হচ্ছে ভুলে গেছি। তোমার বাবাকে নিয়ে যে ঝামেলায় পড়েছি তাতে সব কিছু ভুলে পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব।

তোমার বাবার শরীর সামান্য সেরেছে। এতেই সে নানান ঝামেলা শুরু করেছে। তার ঝামেলা শুনলে তোমারও পিত্তি জ্বলে যাবে। আমি একজন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেছি। আমার পরিকল্পনা দুজনে সমুদ্রের পাড়ে কিছু সময় কাটাব। তারপর ডিনার করব। রোনিও রাতে থেকে যাবে। পরদিন ভোরে আমরা যাব মিসিনিতে ভিলেজ ফেয়ারে।

তোমার বাবা নানান ঝামেলা শুরু করল। তার কথা রোনিও রাতে থাকতে পারবে না। ভাবটা এমন যে, আমি এখনো তোমার বাবার বিবাহিত স্ত্রী।

তোমার বাবার হইচই চিৎকার বাড়তেই থাকল। একপর্যায়ে সে একটা ফুলদানি আমার দিকে ছুড়ে মারল। এনটিক চায়নিজ মিং সময়ের ফুলদানি আমি কিনেছিলাম তিন হাজার ডলার দিয়ে। চোখের সামনে এই জিনিস ভেঙে চুরমার। আমি তোমার বাবাকে বললাম, গেট লস্ট! আর এক মুহূর্ত তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পারবে না।

তোমার বাবা ব্যাগ হাতে গটগট করে বের হয়ে গেল। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোটা সে নষ্ট করে দিয়ে গেল।

যাই হোক, আমার এই বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে তোমাকে বলি। তার একটা কফি শপ আছে। কফি শপের নাম 'নিন্নি ব্ল্যাক। তার প্রধান শখ হলো ঘোড়ায় চড়া। তার তিনটা ঘোড়া আছে। রোনিওর পাল্লায় পড়ে আমাকেও ঘোড়ায় চড়া শিখতে হচ্ছে। তার গলায় পুরোপুরি ঝুলে পড়ার কথা এখনো ভাবছি না, তবে আমরা একসঙ্গে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে চাইছে আমি তার সঙ্গে গিয়ে থাকি। দুই বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্টে সে থাকে। এটাই সমস্যা। বিশাল ভিলায় থেকে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। রোনিওর সঙ্গে বাস করলে নিশিরাতে ভিলার বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব। সব কিছু তো আর একসঙ্গে হয় না। রোনিওর সঙ্গে আমার কিছু মতপার্থক্যও আছে। যেমন, সে সি ফুড পছন্দ করে না। আমি হচ্ছি সি ফুড লাভার। তার লাল রঙ পছন্দ আর আমার অপছন্দের রঙ হচ্ছে লাল। রোনিওর অ্যাপার্টমেন্টের পর্দার রঙ লাল, কার্পেটের রঙ লাল। আমি তাকে পর্দা ও কার্পেট বদলাতে বলেছি। সে রাজি হচ্ছে না। কী করি বলো তো? একটা বুদ্ধি দাও।

তোমার খবর বলল। তোমাকে আমি টিকিট অনেক আগেই পাঠিয়েছি। ঢাকা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে স্পেন। তুমি জানিয়েছ তোমার পাসপোর্ট নেই বলে আসতে পারছ না। তোমার দেশে পাসপোর্ট পাওয়াটা কি অতি জটিল বিষয়? প্রয়োজনে পাসপোর্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্রাইভ দাও। পৃথিবীর সব দেশে, সবসময় সব পরিস্থিতিতে টাকা কথা বলে। তোমার দেশে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ দেখি না।

তোমার বয়স হয়েছে, এই বয়সে তোমার বয়ফ্রেন্ড দরকার। অনেকের সঙ্গে মিশে পছন্দের ছেলে খুঁজে বের করো। তোমার এই অনুসন্ধানে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

তুমি বড় একটা বাড়িতে একা বাস করছ, আমিও তা-ই। এই দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে।

আমাকে চিঠি শেষ করতে হচ্ছে। আমি তোমার বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি। কতটা নির্লজ্জ দেখো–আবার ফিরে এসেছে। দেখো তার কী অবস্থা করি।

ইতি তোমার মা

আন্ধা পীরের কাছে লিবিয়া থেকে কর্নেল ফারুকের পত্র (এই পত্র ইংরেজিতে লেখা, এখানে বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলো)

পীর সাহেব, আসসালামু আলায়কুম।

আমি আপনার এক পরম ভক্ত কর্নেল ফারুক। একটি বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শ এবং অনুমতি চাই। আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার নেতৃত্বে অ্যুত্থান সম্পূর্ণ হয় নাই। বাকি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আপনার দোয়া ছাড়া তা কোনোক্রমেই সম্ভব না।

দেশে ফেরার ব্যাপারে আমি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। তারা বধিরভাব ধারণ করেছে। হা-না কিছুই বলছে না। এই বিষয়েও আমি আপনার দোয়া কামনা করি।

আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
আপনার পরম ভক্ত
কর্নেল ফারুক

আন্ধা পীরও বাংলাদেশ সরকারের মতো বধিরভাব ধারণ করলেন। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

কর্নেল ফারুক আন্ধা হুজুরের অনুমতি না পেয়েও ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্তের পেছনে শেষরাতে দেখা একটি স্বপ্ন কাজ করছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেন একজন বলশালী সৈনিক তাঁকে কাঁধে নিয়ে ঢাকার রাজপথে ঘুরছে। তিনটি ট্যাংক তাদের পেছন থেকে অনুসরণ করছে। প্রতিটি ট্যাংকের ওপর বেশ কিছু অস্ত্রধারী সৈনিক। তারা ক্ষণে ক্ষণে স্লোগান দিচ্ছে 'কর্নেল ফারুক জিন্দাবাদ'।

স্বপ্নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, ফারুকের সামনে ঘোড়ার গাড়িতে আন্ধা হাফেজ বসে আছেন। তাঁর হাতে নীল রঙের ঘুটির তসবি। তিনি হাসিমুখে তসবি টানছেন। তসবি থেকে আলো বের হচ্ছে।

এমন চমৎকার স্বপ্ন দেখে বিদেশের মাটিতে পড়ে থাকা যায় না। কর্নেল ফারুক সিংগাপুর থেকে ঢাকায় আসার টিকিট কাটতে মেজর রশীদকে বললেন। যে-কোনো দিন টিকিট কাটলে হবে না। টিকিট কাটতে হবে শুক্রবারে। তার জন্ম শুক্রবার। এই বিশেষ দিনে তিনি অনেক শুভ কর্ম (?) সম্পাদন করেছেন।

কর্নেল ফারুক ঢাকার এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলেন শুক্রবার ভোরে। তার হাসিমুখ দেখে এয়ারপোর্টের পুলিশ কর্মকর্তারা হকচকিয়ে গেলেন। এই মানুষটিকে কি তারা গ্রেফতার করবেন? এমন নির্দেশ তো তাদের কাছে নেই।

কর্নেল ফারুকের সহযোগী মেজর রশীদ তিন দিন আগে ঢাকা পৌঁছেছেন।

পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে, তিনি তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাসাতেই উঠেছেন। জেনারেল শিশুকে নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতও করেছেন। আন্তরিক পরিবেশে জিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। একসঙ্গে রাতের ডিনার করেছেন। এমন যেখানে পরিস্থিতি সেখানে আগ বাড়িয়ে পুলিশের কিছু করার নেই। তাদের কাজ শুধুই দেখে যাওয়া।

শুক্রবার ভোরে প্রেসিডেন্ট জিয়া নাশতা খাচ্ছিলেন। আয়োজন সামান্য—

চারটা লাল আটার রুটি।

দুই পিস বেগুন ভাজি।

একটা ডিম সিদ্ধ।

জিয়ার সঙ্গে নাশতার টেবিলে বসেছেন তার বন্ধু এবং সহযোদ্ধা জেনারেল মঞ্জুর।

জেনারেল মঞ্জুর বিস্মিত হয়ে বললেন, এই আপনার নাশতা?

প্রেসিডেন্ট বললেন, হতদরিদ্র একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাশতা কি যথেষ্ট না?

জেনারেল মঞ্জুর প্রসঙ্গ বদলে বললেন, এই মুহূর্তে ঢাকা এয়ারপোর্টে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কফির মগ হাতে ঘুরছেন। সবার সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। হাত মেলাচ্ছেন। কোলাকুলি করছেন। এই তথ্য কি আপনার কাছে আছে?

জিয়া বললেন, আছে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আছে।

আমি কি জানতে পারি?

পারো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, কর্নেল ফারুক উঠবে ক্যান্টনমেন্টে রশীদের বাসায়। সেখান থেকে সে যাবে ফার্স্ট বেঙ্গল ক্যাভালরিতে।

বলেন কী?

এই অবস্থায় আপনি নির্বিকারে নাশতা করছেন?

জিয়া শান্ত গলায় বললেন, তুমি হলে কী করতে? নাশতা খাওয়া বন্ধ করে ফাস্ট বেঙ্গল ক্যাভালরিতে ছুটে যেতে?

মঞ্জর চুপ করে রইলেন। জিয়া বললেন, হিটলারের ডেজার্ট ফক্স জেনারেল রোমেলের একটি কথা আমার খুব পছন্দ। জেনারেল রোমেল বলতেন, সবাই চোখ-কান খোলা রাখে। আমি নাকও খোলা রাখি। গন্ধ শুঁকি। বিপদের গন্ধ শোঁকা যায়।

আপনি তাহলে নাক খোলা রেখেছেন।

Yes, my noses are open.

কর্নেল ফারুক পূর্ণ সামরিক পোশাকে ফাস্ট বেঙ্গল ক্যাভালরিতে উপস্থিত হয়েছেন। তারিখ চব্বিশে সেপ্টেম্বর। তাকে দেখে অফিসার এবং সৈনিকেরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। কর্নেল ফারুক স্বপ্নে যেমন দেখেছেন তেমন ঘটনাও ঘটল। কিছু সৈনিক তাকে কাঁধে নিয়ে চিৎকার করতে লাগল, কর্নেল ফারুক জিন্দাবাদ।

একটি ট্যাংক থেকে শূন্যে তিনবার উল্লাসের গোলা বর্ষণও করা হয়। পূর্ণ রাজকীয় সংবর্ধনা।

কর্নেল ফারুকের নিজস্ব সৈনিক বেঙ্গল ল্যান্সার বগুড়ায়। তাদের কাছে ফারুকের আগমন সংবাদ পৌঁছে গেছে।

তারা ভয়াবহ হইচই শুরু করেছে। তাদের দাবি কর্নেল ফারুক আমাদের প্রধান। তাঁকে আমাদের মধ্যে চাই। তাঁকে ছাড়া আমাদের চলবে না।

কর্নেল ফারুক বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে তার নিজের ইউনিট বেঙ্গল ল্যান্সারের কাছে উপস্থিত হলেন ২৫ সেপ্টেম্বর। বেঙ্গল ল্যান্সারের অফিসার ও জোয়ানদের আনন্দ এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করল। সেই দিনই মেজর ডালিম ব্যাংকক থেকে ঢাকায় উপস্থিত। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত। কর্নেল ফারুক তার ট্যাংকবাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হলেই হয়।

জিয়া প্রেসিডেন্ট ভবনে কর্নেল ফারুকের বাবাকে ডেকে এনেছেন। যথারীতি জিয়ার চোখ সন্ধ্যার পরও কালো চশমায় ঢাকা। তার চোখের ভাষা পড়ার কোনো উপায়ই নেই।

প্রেসিডেন্ট জিয়া কর্নেল ফারুকের বাবার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার ছেলের ওপর আমি যথেষ্টই বিরক্ত হয়েছি। তাকে অনেকখানি প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, আর দেওয়া হবে না। আমি তার পরিকল্পনার কথা জানি। সে ট্যাংকবহর নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হবে। আমি আরিচা ফেরিঘাটে একটি ইনফেনট্রি রেজিমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা ট্যাংক রেজিমেন্ট প্রতিহত করবে। বিমান বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নির্দেশ পাওয়ামাত্র তারা বোমা বর্ষণ করবে। বেঙ্গল ল্যান্সার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না। আপনি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন?

আমি আপনার কথা মন দিয়ে শুনে কিছু হবে না। আমার ছেলেকে মন দিয়ে শুনতে হবে।

আপনি তাকে শোনাবেন।

আমি শোনাব।

হ্যাঁ। একটি আর্মি হেলিকপ্টার আপনাকে আপনার ছেলের কাছে নিয়ে যাবে।

কখন?

এখন। এই মুহূর্তে। আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে এই হেলিকপ্টারেই ফেরত আসবেন।

আমার ছেলেকে কি গ্রেফতার করা হবে।

না। বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আপনি কথা দিচ্ছেন?

প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন, আমি কখনোই কথা দেই না, কিন্তু আপনাকে কথা দিচ্ছি।

কর্নেল ফারুকের বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে নিয়ে সেই হেলিকপ্টারে করেই ফিরলেন। কঠিন পাহারায় কর্নেল ফারুক, মেজর রশীদ এবং মেজর ডালিমকে ব্যাংককগামী এক প্লেনে তুলে দেওয়া হলো। কাকতালীয়ভাবে দিনটি ছিল শুক্রবার।

প্রেসিডেন্ট ভবনে জিয়াউর রহমান রাতের ডিনার সারছেন। ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ারে ডিনার ক্যান্টনমেন্টে তার বাসা থেকে এসেছে। মেন্যু দেওয়া হলো—

পটল ভাজি

মলা মাছের ঝোল

ডিমের ঝোল

ডাল। জিয়া

বিড়বিড় করে বললেন, আমি সবসময় বলি, ডিনার বা লাঞ্চে যেন আমাকে তিন আইটেমের বেশি না দেওয়া হয়। এরা সবসময় আমার আদেশ ভঙ্গ করে। don't like that.

জিয়ার সামনে জেনারেল মঞ্জুর বসে আছেন। তাঁর গায়ে জেনারেলের পূর্ণ পোশাক। তার মুখ মলিন। জিয়া বললেন, তুমি কি কিছু বলতে এসেছ, নাকি আমি কীভাবে ডিনার করি তা দেখতে এসেছ?

আমি কিছু বলতে এসেছি।

বলে ফেললো। পেটে কথা জমা করে রাখলে আলসার হয়। আমি চাই না আমার অফিসাররা আলসারের রোগী হোক।

জেনারেল মঞ্জুর বললেন, কর্নেল ফারুককে সমর্থন জানিয়ে যেসব অফিসার ও সৈনিক আনন্দ করেছে তাদের সবাইকে আপনি গ্রেফতার করেছেন। সামরিক আদালতে বিচারও শুরু হয়েছে।

সেটাই কি স্বাভাবিক না?

না।

না কেন?

যার কারণে আজকের এই সামরিক আদালত সেই কর্নেল ফারুককে কিন্তু আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। তার বিচার করেন নি।

জিয়া শান্ত গলায় বললেন, আমার সঙ্গে তর্ক করবে না। আমি তার্কিক পছন্দ করি না। অকর্মারাই তর্ক পছন্দ করে। একটা কথা শুধু খেয়াল রাখবে বাংলাদেশ শক্তের ভক্ত।

শক্ত জিয়াউর রহমান তার শক্তি দেখাতে শুরু করলেন। মাত্র দুই মাসে জিয়াউর রহমানের নির্দেশে ঘটিত সামরিক আদালতে সরকারি নথিপত্রের হিসাবে ১৯৭৭ সনের ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ১১৪৩ জন সৈনিক ও অফিসারকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে।

বাংলাদেশের কারাগারের বাতাস তরুণ সব সৈনিক ও অফিসারের দীর্ঘশ্বাস এবং হতাশ ক্রন্দনে বিষাক্ত হয়ে ছিল। আহারে!

২৩. জিয়াউর রহমানের পাঁচ বছর

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।
(খনা)

জিয়াউর রহমানের পাঁচ বছরের শাসনে প্রতি মাঘের শেষে বর্ষণ হয়েছিল কি না তার হিসাব কেউ রাখে নি, তবে এই পাঁচ বছরে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় নি। অতি বর্ষণের বন্যা না, খরা না, জলোচ্ছাস না।

দেশে কাপড়ের অভাব কিছুটা দূর হলো। দ্রব্যমূল্য লাগামছাড়া হলো না। বাংলাদেশের নদীতে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়তে লাগল।

বাংলাদেশের মানুষ মনে করতে রু করল অনেকদিন পর তারা এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান পেয়েছে যিনি সৎ। নিজের জন্যে কিংবা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্যে টাকাপয়সা লুটপাটের চিন্তা তার মাথায় নেই। বরং তার মাথায় আছে দেশের জন্যে চিন্তা। তিনি খাল কেটে দেশ বদলাতে চান।

জিয়া মানুষটা সৎ ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। লোক দেখানো সৎ না, আসলেই সৎ। তার মৃত্যুর পর দেখা গেল জিয়া পরিবারের কোনো সঞ্চয় নেই। বাংলাদেশ সরকার জিয়া পরিবারের সাহায্যে তখন এগিয়ে এল। বাংলাদেশ সরকার যা করল তা হলো—

১. জরুরি ভিত্তিতে দশ লক্ষ টাকা নগদ মঞ্জুরি।

২. এক টাকা দামে ঢাকায় অভিজাত এলাকায় বিশাল বাড়ি বিক্রি।

৩. ২৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের দুই পুত্র তারেক এবং কোকোর দেশের ভেতর কিংবা দেশের বাইরের পড়াশোনার সমস্ত খরচ সরকারের। এই সময় দুই ছেলে মাথাপিছু পনের শ' টাকা ভাতাও পেতে থাকবে।

৪. সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দুই পুত্রের দেশের ভেতর ও বাইরের সমস্ত খরচ বহন করবে।

৫. সরকার এই পরিবারের জন্যে একটি গাড়ি দেবেন। গাড়ির ড্রাইভার ও পেট্রোল খরচ সরকার বহন করবেন।

৬. এই পরিবারকে একটি টেলিফোন বরাদ্দ করা হবে। টেলিফোনের খরচ সরকার বহন করবে।

৭. খালেদা জিয়ার বাড়িতে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির খরচ সরকার বহন করবে। বাড়ি পাহারার ব্যবস্থাও সরকার করবে।

৮. খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সহকারী এবং পাঁচজন গৃহভৃত্যের খরচ সরকার বহন করবে।

এগুলি হলো জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরের ব্যবস্থা। তার আগে ফিরে যাই। অর্থনৈতিকভাবে অতি সৎ একজন মানুষের দেখা পেয়ে বাংলাদেশের মানুষ আনন্দিত হলো। মূল কারণ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এই ধরনের মানুষ তারা আগে দেখে নি।

বুদ্ধিজীবী এবং কবি-সাহিত্যিকরা জিয়াকে বিশেষ করে, তার খালকাটা প্রকল্পকে সমর্থন জানালেন। কবি শামসুর রাহমানকে এক খাল কাটা উৎসবে লাল টাই পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

প্রচারমাধ্যমগুলি জিয়াউর রহমানের সততার গল্প প্রচার করতে শুরু করল। যেমন, এই মানুষটির দুটি মাত্র শার্ট। উনি যখন বিদেশে যান তখন আলাদা বিমানে যান না। সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানে যান। বিমানের খাবার খান না। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে যান।

জিয়াউর রহমান বিদেশে বেশকিছু ভালো বন্ধু পেলেন। যেমন, সৌদি আরবের বাদশাহ। বাদশার নিমন্ত্রণে জিয়া সৌদি আরব গেলেন। সঙ্গে করে বাদশার জন্য উপহার হিসেবে পাঁচ শ' নিমগাছের চারা নিয়ে গেলেন। ব্যতিক্রমী এই উপহার দেখে বাদশাহ অবাক এবং আনন্দিত হলেন। বিশেষ তত্ত্বাবধানে পাঁচ শ' চারা লাগানো হলো। সৌদি আরবের জন্যে গাছগুলি আশীর্বাদের মতো হলো। ধূসর মরুভূমিতে নিয়ে এল সবুজের মায়া। সৌদি আরবে নিমগাছের নাম জিয়া গাছ।

বেলজিয়ামের রাজা ও রানির সঙ্গে জিয়াউর রহমানের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হলো। তিনি তাদের জন্যে বাংলাদেশের দুটি হস্তিশাবক উপহার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুই হস্তিশাবকের স্থান হলো রানির ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায়। জিয়ার আমন্ত্রণে রাজা-রানি বাংলাদেশ সফরে এলেন।

জিয়াউর রহমান অতি ভাগ্যবান মানুষদের একজন। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশের সপ্তম প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম এক ঘোষণায় জানান—

'আমি, সাদাত মোহম্মদ সায়েম শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেছি এবং তার কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করছি।'

শারীরিক অসুস্থতায় কাতর হয়ে প্রেসিডেন্ট সায়েম জিয়াকে প্রেসিডেন্ট বানান নি। জিয়া এই ঘোষণা দিতে তাঁকে বাধ্য করেছিলেন।

রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা হাতে নিয়ে জিয়াউর রহমান স্বৈরশাসক হয়ে গেলেও বাংলাদেশের অনেক মানুষ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। তারা ভাবল, কী শক্তিমান প্রেসিডেন্ট! এমন মানুষই আমাদের প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কঠিন যুদ্ধাপরাধীদের (গোলাম আযম) পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে এনে নাগরিকত্ব দিলেন এবং বিশেষ ক্ষমতায় বসালেন। সামরিক শৃঙ্খলার অজুহাতে সেপাই ও অফিসারদের গোপন সামরিক আদালতে বিচার হতেই থাকল। এদের দীর্ঘনিঃশ্বাস জমা হলো চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে। তারিখ ৩০ মে রাত এগারোটা। জিয়া প্রাণ হারান তার একসময়ের সাথী জেনারেল মঞ্জুরের পাঠানো ঘাতক বাহিনীর হাতে।

জেনারেল মঞ্জুরের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী অফিসারদের একজন। মাত্র ২০ বছর বয়সে কমিশন লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের

শিয়ালকোটে বন্দি ছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। শিয়ালকোট থেকে তাঁর সঙ্গে আরও একজন পালিয়েছিলেন, তার নাম কর্নেল তাহের। এই দুজনই মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে 'বীর উত্তম' খেতাবধারী।

বলা হয়ে থাকে, জেনারেল মঞ্জুর তার রূপবতী স্ত্রী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। এই স্ত্রী মঞ্জুরের শেষ দিন পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিলেন।

সেনা অভ্যুত্থান ঘটানো এবং জিয়া হত্যার পেছনে প্রলয়ংকরী স্ত্রী বুদ্ধি কাজ করে থাকতে পারে।

২৪. গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা : প্রাথমিক তথ্যবিবরণী থেকে চূড়ান্ত রায়, স্বপন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স।

২. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম, তাম্রলিপি।

৩. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ফ্যাক্টস এণ্ড ডকুমেন্টস, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ; চারুলিপি।

৪. বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের ইতিহাস, ড, মোহাম্মদ হাননান, আগামী প্রকাশনী।

৫. রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫, নির্মলেন্দু গুণ, বিভাস প্রকাশনা।

৬. উত্তরাধিকার, শ্রাবণ সংখ্যা ১৪১৭, বাংলা একাডেমী।

৭. Inside RAW, the Story of India Secret Service. Asoka Raina. Vikas Publication, New Delhi, India

৮. Bangladesh : The Unfinished Revolution, Lawrence Lifschultz, Zed Press, London.

৯. Bangladesh : A Legacy of Blood, Anthony Mascarenhas, Hodder and Stoughton, London.

১০. ক্রাচের কর্নেল, শাহাদুজ্জামান, মাওলা ব্রাদার্স।

১১. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস; হাক্কানী পাবলিশার্স।

১২. অসমাপ্ত বিপ্লব : তাহেরের শেষ কথা, লরেন্স লিফসুলৎস; নওরোজ কিতাবিস্তান।

১৩. পঁচাত্তরের রক্তক্ষরণ, মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম; আফসার ব্রাদার্স।

১৪. বাংলাদেশের রাজনীতি : ১৯৭২-৭৫, হালিম দাদ খান; আগামী প্রকাশনী।

১৫. ১৫ই আগস্ট-মমদ মৃত্যুচিন্তা, সম্পাদনা : আহমেদ ফিরোজ; মিজান পাবলিশার্স।

১৬. মুক্তিযুদ্ধের দলিল লণ্ডভণ্ড এবং অতঃপর, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সুচীপত্র।

১৭. বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১, ব্রি. জে. এম সাখাওয়াত হোসেন, পালক প্রকাশনী।

১৮. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স।

১৯. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীরবিক্রম, সাহিত্যপ্রকাশ।

২০. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ, প্রথমা।

২১. শতাব্দী পেরিয়ে, হায়দার আকবর খান রনো; তরফদার প্রকাশনী।

২২. সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা : **১৯৭৫** থেকে **১৯৮১**, আনোয়ার কবির, সাহিত্যপ্রকাশ।

২৩. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, লে. কর্নেল এম. এ. হামিদ; মোহনা প্রকাশনী।

২৪. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন, প্রথমা।

২৫. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দীন আহমদ, আগামী প্রকাশনী।

২৬. ফাঁসির মঞ্চে তেরোজন মুক্তিযোদ্ধা, আনোয়ার কবীর, মাওলা ব্রাদার্স।

২৭. বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, সম্পাদনা : তারেক শামসুর রহমান, শোভা প্রকাশ।

২৮. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের, ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, আগামী প্রকাশনী।

২৯. তাহেরের স্বপ্ন, ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, মাওলা ব্রাদার্স।

৩০. জিয়া হত্যা : নেপথ্যে কারা, কাউসার ইকবাল, বিদ্যাপ্রকাশ।